যোগজীবন।

সামাজিক উপন্যাস।

'শরচ্চন্দ্র', 'বিরাজমোহন', 'সন্ন্যাসী', 'সোপান', ও 'ভিখারী'

প্রণেতা

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

"Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

What shall it profit a man, if he gain the whole world, and lose his own soul."

Bible.

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে,

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

এবং

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১০/৪ নম্বর ভবন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১২৮৯।

উৎসর্গ।

প্রিয় সুহৃদ—মানিকদহের জমিদার—

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায়।

প্রিয় বিপিন বাবু,

সংসার আপনাকে যে ভাবে আলিঙ্গন করিতেছে, প্রশংসা করিতেছে, স্তুতি করিতেছে, ঈশ্বরের প্রসাদে এই দীন আজ সে ভাব লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না। সংসারের চক্ষে আপনি যে উচ্চ স্থানে বসিয়া আছেন, আমার চক্ষে আপনি আর সে উচ্চ স্থানে নাই, যদি থাকিতেন তবে এ দীন আজ আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত না,—সংসারের বড় লোকের সন্নিধানে দীন দুঃখীর যাইবার অধিকার কি? আজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে, সংসারের লোকের ন্যায় নজর, ভেট লইয়া আর আমাকে যাইতে হয় না,—হৃদয়ের নিভৃত স্থানে যখন প্রবেশ করি, প্রেমনয়নে যখন অঞ্জন লেপিয়া দি, তখনই এই দীনের কুটীরে মলিন বেশে আপনাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই ;—দেখিতে দেখিতে আপনার নয়নের জল আর আমার নয়নের জল মিশিয়া যেন এক হইয়া যায়,—দেখি আপনি আর সিংহাসনে নাই, আমিও কুটীরে নাই,—দুই এক হইয়া গিয়াছি। এক প্রেমের লীলাখেলায় উচ্চ ও নীচের মিলন, ধনী ও নির্ধনের মিলন, সংসারে এ কি ব্যাপার দেখিলাম! যাহা আপনিও পূর্ব্বে ভাবেন নাই, আমিও কল্পনা করি নাই,—সংসারও বুঝিতে পারে নাই,—বন্ধুবান্ধবও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই, বিধাতার প্রসাদে এই মর্ত্ত্যলোকে সেই ঘটনা ঘটিল। এই মিলনের মূল কোথায়, আপনি জানেন কি? ঈশ্বরবিশ্বাস, ভগবৎভক্তিতেই ইহার মূল নিহিত। অভক্ত সংসার এই মিলন দেখিয়া হাসিবে, ঠাট্টা করিবে, নিন্দা করিবে, বিচিত্র কি? আমরা উভয়ে যতদিন সেই মূলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিব, ততদিন সংসার কোন ক্রমেই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। আজ আসুন, উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমাদিগের মিলনের মূলমন্ত্র উচ্চারণ করি,—জীবের জীবন, আমাদিগের আত্মার অন্তরাত্মা, সর্ব্ব ভূতের নিদানকে স্মরণ করি।

পবিত্র শীতল জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিলে যেমন শরীর শীতল ও পবিত্র হয়, ভক্তিসরিতে অবগাহন করিলে সেই প্রকার হৃদয় মন সুস্থ হয়, পবিত্র হয়, সংসারের পাপ-ময়লা চলিয়া যায়। পবিত্রস্বরূপকে চিন্তা করাই ভক্তি সাগরের অবগাহন। আপনি অবগাহন করিয়া সংসারের বেশ ভূষা রাখিয়া ধীরে ধীরে দীনের সহিত আসুন। কোথায় যাইতে বলিতেছি? কেন যাইতে বলিতেছি?—এদীনের হৃদয়ভাণ্ডারের দুঃখকাহিনী শুনিতে। অনেক দিন হইতে আপনাকে অনেক কথা বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত সময় পাই নাই, উপযুক্ত স্থান পাই নাই। দুঃখকাহিনী শুনিতে আহ্বান করিতেছি, তজ্জন্য পবিত্র হইয়া আসিতে বলিলাম কেন? সংসারটাকে আমি বড় ভয় করি, ইহাতে যে সকল দূষিত ভাব আছে, তাহাতে সহজেই মনকে অপবিত্র করিয়া দেয়। আমার কাহিনী শুনিবার সময় দ্বেষ, ঘৃণা, আত্মাভিমান প্রভৃতি বড় লোকের বেশ ভূষা খুলিয়া রাখিতে হইবে। এ প্রকার করা একদিকে অত্যন্ত কঠিন কথা, কিন্তু আমি যে অবগাহনের কথা বলিতেছিলাম, তাহা যদি করিতে পারেন, তবে অনায়াসে এই কঠিন সমস্যা পূরণ হইবে। আপমি প্রস্তুত হইবেন কি? অবশ্য হইবেন, নচেৎ আমার এ কাহিনী আর কে শুনিবে?—তবে ধীরে ধীরে পবিত্র অন্তরে আসুন।

আসিয়াছেন?—তবে এই নিন,—আমার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব—এই যোগজীবন নিন। আমার হৃদয়ের সমস্ত বক্তব্য ইহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাকে হয় জীবনের ভূষণ করিবেন, না হয় পদদলিত করিবেন;—আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। যদি যোগজীবনের দুঃখ পূর্ণ কাহিনীর ভিতর দিয়া যাইতে আপনার হৃদয়ে কোন অপবিত্র ভাব উপস্থিত হয়, তবে আবার অবগাহন করিবেন,—যদি আমার প্রতি ঘৃণা হয়, তবেও অবগাহন করিবেন। আমি প্রার্থনাপূর্ব্বক যোগজীবনে হৃদয়ের কথা সন্নিবদ্ধ করিয়াছি, আপনিও প্রার্থনাপূর্ব্বক পাঠ করিবেন;—যদি আপনার হৃদয় ক্লান্ত হয়, অবসন্ন হয়, সেই দীনশরণকে ডাকিবেন। তিনিই আশা, তিনিই ভরসা, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে, আজ আমার হৃদয়ের ভূষণ এই যোগজীবনকে আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম।

প্রেমভিখারী—দেবীপ্রসন্ন।

সন্ন্যাসীর সমালোচনার সারাংশ।

ভারতমিহির—২১ শে চৈত্র ১১৮৫। মরীচির পবিত্র প্রেম, সরল স্বভাব, স্বদেশানুরাগ আমরা অনেক দিন বিস্মৃত হইতে পারিব না। সন্ন্যাসী আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে উচ্চ শ্রেণী প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত।

তত্ত্বকৌমুদী—১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক।—দেবী বাবু উপন্যাসের একটী নূতন মূর্ত্তি বঙ্গ সমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। অদম্য দেশ-হিতৈষণা, অনাবিল স্বর্গীয় প্রেম, ইন্দ্রিয় দমনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি, পাপের ভীষণ পরিণাম, ইহাঁর উপন্যাসের ব্যক্তি নিচয়ের জীবনে জ্বলন্ত রূপে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। কুসংসর্গের বিষময় ফল, দৃঢ়-প্রোথিত পাপের মূলোৎপাটনের অসার চেষ্টা হরনাথের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। স্বাধীনতার অদম্য উৎসাহ ও নির্ভীকতা যশলালের জীবনে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে, স্বর্গীয় প্রেমের মহান দৃষ্টান্ত সুরবালা ও মরীচির জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে। উপন্যাস লিখিতে গেলেই প্রেমের পঙ্কিল মূর্ত্তির অবতারণা করিতে হয়, এই যাঁহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা দেবী বাবুর গ্রন্থ হইতে শিক্ষা লাভ করুন। এই প্রকার নীতি পূর্ণ উপন্যাস বাহুল্যরূপে প্রচার হইলেই লোকের কুরুচি পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। দেবী বাবু আমাদের ও বঙ্গ সমাজের ধন্যবাদার্হ।

Brahmo Public Opinion—March 2, 1882.—Babu Devi Prasanna Ray Chaudhuri, the author of the Book is well known to the Public as the author of Sarat Chandra, Birajmohan and Sopan. He has now issued the second edition of this interesting book having enlarged and improved it considerably. We have gone through the book very carefully, and we have no hesitation in pronouncing it to be worthy of a place in the library of every young man in this country. The style is chaste and the diction pure. There is a high moral tone pervading the book. Haranath is the very picture of a spoilt young lad just coming to large property, and the pernicious influence of corrupt associates on a lad of Haranath's age and position is faithfully described. Surabala, Haranath's wife is the very ideal of a lovely and faithful Hindoo wife, and the portion where the young woman, being driven to poverty and ill-treated by her neighbours and relations, became a *sanyasini* (religious mendicant) is really very touching indeed. The *Gurudeva* (spiritual guide) has been very well pourtrayed. This sage and devotee has been made the mouth-piece of the author's high moral and religious sentiments. We were simply charmed with the instruction which this reverend *Guru* gave to Haranath to go and live amidst the temptations of the world to try the strength of his religious life. The struggle which this advice caused in the youthful *Sanyasi* when *Marichee* expressed her love for him, is beautifully described. The interview of Haranath and Surabala, both lost to the world as *Sanyasi* and Sanyasini and their parting never to meet again, is very touching indeed. Every reader of *Sanyasi* must enquire what became of Surabala. Her character is

so attractive that the reader cannot easily forget her, does not like to leave her where she is left. The character of *Marichee* is well drawn. She is a Lepcha-girl, sprightly, lovely, and simplicity personified. Her strength of character, her love of freedom, the love for her country, the regard for her father, all these virtues are attractive, and Marichee is a favorite character in the book. On the whole, the book furnishes enough of pleasant reading.

সোমপ্রকাশ—৮ই চৈত্র ১২৮৮। অধুনা কুরুচি সম্পন্ন বহুতর উপন্যাস লিখিত হওয়াতে সহর্জে আমরা ইহারও পাঠে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকার ইহাতে বীর, করুণ, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের সমাবেশ করিয়া হৃদয়-গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। প্রণয়ের ফল, অর্থের মোহিনী শক্তি, জিগীষা বৃত্তির পরিণাম প্রভৃতি ইহাতে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। এখানি কেবল উপন্যাস নহে, ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিষয়েরও অনেক পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ উপন্যাসের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

হিন্দুদর্শন—চৈত্র ১২৮৮। * * * যশোলালের চিত্র কাল্পনিক নহে; যশোলাল সিকিমের প্রতাপসিংহ। তাঁহার অমানুষিক বিক্রম, জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ ও সিকিমের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তিনি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয় চিত্তে সিকিম সম্বন্ধে যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আমরা যে বাঙ্গালী, আমাদের নিস্তেজ অন্তরেও স্বদেশের জন্য প্রাণদানের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। মরীচির পিতৃভক্তি, স্বদেশানুরাগ ও নিঃস্বার্থ প্রেম অসাধারণ। সুরবালা যে রমণীকুলের রত্ন ছিলেন, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি; তিনি ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার ভালবাসা চৈতন্য দেবের ন্যায় সাধারণ মনুষ্যের উপর ছড়াইয়া পড়িল, সুরবালা দেবী। * * * লেখকের উপন্যাস দুখানি পড়িয়া (সন্ন্যাসী ও ভিখারী) বাস্তবিক আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। লেখকের স্বদেশানু-রাগ ও ধর্ম্মনীতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত ভক্তি বাস্তবিক প্রশংসার্হ। গ্রন্থ দুখানিতে অশ্লীলতা বা কুনীতির নাম গন্ধও নাই। পিতা কন্যার সমক্ষে ও পুত্র মাতার সমক্ষে অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে প্রেমের ঢলাঢলি, বিচ্ছেদের হা হুতাশ, পত্রে পত্রে হা প্রেয়সী, হা প্রাণনাথ বা হা হতোস্মির ছড়াছড়ি নাই। প্রতি পত্রে Burns ও Scott এর স্বদেশানুরাগ দীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে এই দুইখানি পুস্তককেই উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস মধ্যে পরিগণিত করিতে পারি। দেবীপ্রসন্ন বাবু প্রণীত উপন্যাস তাঁহার উন্নত ও পবিত্র হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ হইয়া বঙ্গসাহিত্যসংসারে চিরদিন শোভা পাইতে থাকুক।

এতদ্ভিন্ন নববিভাকর, সাধারণী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা প্রসিদ্ধ পত্রিকাই এ গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন, স্থানাভাবে তাহা সন্নিবদ্ধ হইল না।

ভিখারীর সমালোচনার সারাংশ।

বঙ্গবাসী—১লা ফাল্গুন ১২৮৮। একে একে দেবীবাবু চার খানি আখ্যায়িকা লিখিলেন। তাঁহার আখ্যায়িকা সকলে বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটী কূট প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে—সকলগুলিই ধর্ম্মভাবজড়িত—সকল গুলিতেই এক একটী সাধু-সত্য-বীর পুরুষের অবতারণা করা হইয়াছে—যে বীরত্ব থার্মপেলি বা মারাথনে পরীক্ষিত হয়—এ সে বীরত্ব নহে—যাহার পরীক্ষা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে—যাহার শত্রু সমগ্র দেশ ও সমাজ—যাহার জয়ে একটী কি দুইটি বৃত্তি নহে—আধ্যাত্মিক ও মানসিক সকল বৃত্তিগুলির শাসন পরিচালন আবশ্যক করে—ইহা সেই বীরত্ব। থিয়েটরের বীরত্বে নহে—যে বীরত্বে ওসমান জগৎসিংহকে বন্দী করেন, সে বীরত্ব নহে—যে বীরত্বে তিলোত্তমা আয়েসার নিকট পরাজিত, ইহা সেই বীরত্ব—এজন্য আমরা দেবী বাবুর আখ্যায়িকা পড়িতে ভালবাসি। * * * দেবী বাবুর ভাষা সাধারণের বোধগম্য—সহজ সতেজ—সাধারণতঃ বল প্রকাশ করে না, আবশ্যক হইলে রঙ্গক্ষেত্র কম্পিত করিয়া তুলে, চিত্রের পর চিত্র, মেঘ তিমির আকাশে বিদ্যুতের ছটা দেখাইয়া চমকিত করিয়া দেয়—বরাবর সমান কুসুম কানন নহে—পর্ব্বতের উপত্যকা, তরঙ্গায়িত। ভিখারী পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম—ভীত হইলাম—শঙ্কিত হইলাম।

Brahmo Public Opinion. March 2, 1882.—This is intended to be a romance illustrating some of the social problems of the day, such as widow marriage, early marriage, the abject condition of the Bengal tenantry, the oppression which they suffer from their land-lords, the rapidity with which resolutions, formed by our educated countrymen while at Colleges, melt away immediately on entering the threshold of the worldly life, the corruptions of the muffosil police, *et hoc genus omni.* It is always a difficult task to write a romance developing and illustrating so many social problems in the compass of a single book, yet this is the task attempted by our author, and we cannot but make the same remark which we made about his *Sanyasi* that taken part by part, he has greatly succeeded in his work. *Bhikari,* the hero of the work is a consistent character throughout. The high resolves for doing good to the country which he formed while at College, he carried into practice. Kripanath and Brojonath faithfully deliniate the exact position which some of our countrymen who have been to England occupy, and the indifferent manner in which they treat their own countrymen. The majority return with no principles whatever immensely selfish, supremely conservative about the liberty which their women should enjoy in society, and highly self-conceited and self-opinionated, utterly careless of what is passing in the world, and laughing in their sleeves when others talk of their country's regeneration. Brojonath and Kripanath are prototypes of this class. The oppression of the tenantry is very well depicted in the looting of Ishan's house, and the corruption of the police in the way in which Beharilal's complaint was shelved, and the zemindar's complaint ended in Behari's imprisonment. Bijay's character is also well drawn to shew how the most sincere religionists in younger days grow confirmed sceptics, The character of Giribala is also well

drawn. * * * On the whole the book is a readable one and interesting. There is one feature in all his writings, which separates them from all the rubbish that is published now-a-days as literature, viz, a high moral tone and freedom from vulgarity in any shape. Such books are very rare in the vernacular of the country, and as such the writer should be greatly encouraged by the reading public.

সোমপ্রকাশ—২৯শে চৈত্র ১২৮৮।—গ্রন্থকার সমাজে অপরিচিত নহেন। তিনি এ গ্রন্থে সকল রসেরই অবতারণা করিয়াছেন, দূষিত প্রণয়ে পুস্তক খানি কলঙ্কিত হয় নাই,—জমিদারের অত্যাচার, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা, শিক্ষিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতা, চিত্তচাপল্য ও চিত্ত দৌর্ব্বল্যতা, দস্যুর মনে ধর্ম্ম ভাব, প্রকৃত জ্ঞানী বিহারীর ধৈর্য্য ও আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং চিন্তামণির অকৃত্রিম প্রণয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এরূপ উপন্যাসের বহুল প্রচার সমাজের বিশেষ মঙ্গলকর।

হিন্দুদর্শন,—চৈত্র ১২৮৮।—ভিখারীর বিহারী সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; স্বদেশবৎসল ও ঈশ্বর পরায়ণ। * * * ধন্য বীরত্ব ! হায় ! বাঙ্গালীর মধ্যে এ চিত্র কে দেখিবে ? বিহারীর হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া কে তাঁহার সহিত কাঁদিতে বসিবে ? বিহারীর ন্যায় উন্নত হৃদয় পুরুষ এই অত্যাচারপূর্ণ বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে অন্ততঃ এক একটী যদি জন্মগ্রহণ করেন, আমরা বেশ বলিতে পারি, তবে বঙ্গের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া অচিরে একটী সুখ নিকেতনে পরিণত হয়। কিন্তু হায়, কল্পনা কি কখন সত্যে পরিণত হইবে ? বিহারী মনুষ্য হইয়াও দেবতা। বিহারীর চরিত্রে আমরা কোন খুৎ পাইলাম না। যেমন তাঁহার ধর্ম্মনীতির প্রতি অনুরাগ, তেমনি তাঁহার স্বদেশের প্রতি অচলাভক্তি, আবার তেমনি তাঁহার আত্ম বিসর্জ্জনের অদ্ভুত ক্ষমতা। * * বিহারীই যথার্থ বীর পুরুষ, তাঁহার বীরত্ব অধ্যয়ন করিতে করিতে তিনি যে একজন মনুষ্য একথা বিস্মৃত হইয়া যাই ;—সময়ে সময়ে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভ্রম হয়। * * এ অত্যাচারপূর্ণ মর্ত্যভূমি বিহারীর উপযুক্ত বাসস্থান নহে। তিনি যদি কোন দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেন, যেখানে দুর্ব্বলের উপর পীড়ন নাই, অন্যায় ও পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিবার ক্ষমতা কাহার নাই,—যেখানে মনুষ্য স্বর্গে যাইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করে না, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহেই সুখী হইতে পারিতেন। কুসুম সম্বন্ধে দেশাচারউপাসক সঙ্কীর্ণ হৃদয় মনুষ্যগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, তিনি রমণীকুলের রত্ন ছিলেন।

নববিভাকর—২৯ শে চৈত্র ১২৮৮।—আমরা ভিখারী পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। বিলাত হইতে পুনরাগত কোন কোন যুবক স্বদেশের প্রতি কিরূপ কুব্যবহার ও স্বদেশীয়দিগের সহিত কিরূপে অভদ্র আচরণ করেন, তাহার কয়েকটী জীবন্ত চিত্র এই পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে। * * * সাধারতঃ সমাজগত দোষ সংশোধনই দেবী বাবুর প্রধান উদ্দেশ্য। ভিখারী পড়িলে যুগপৎ চিত্তবিনোদন ও উপদেশ লাভ হয়, এটী সমালোচিত গ্রন্থের একটী মহৎগুণ বলিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরো কতিপয় পত্রিকা ভিখারীর প্রশংসা করিয়াছেন, স্থানাভাবে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

যোগজীবন

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার ছাত্রনিবাস।

কলিকাতার ছাত্রদিগের বাসা এক আশ্চর্য্য জিনিস। মানব জীবনের পরম সুখের সময় ছাত্রাবস্থা; এই সময়ে যে সকল ছাত্র ভাবী জীবনের বীজ অন্তরের নিভৃত স্থানে সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহারাই কালে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হন। কলিকাতা মহানগরীতে অনেক ছাত্র সেই বীজ সংগ্রহার্থ বৎসরের অধিক সময় বাস করিয়া থাকেন। জনক, জননী, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদিগের ভালবাসার আকর্ষণ-রজ্জু ছেদ করিয়া শিক্ষার অনুরোধে পূর্ব্ব বাঙ্গলা, উত্তর বাঙ্গলা এবং পশ্চিম বাঙ্গলার অনেক ছাত্র কলিকাতায় বসতি করিয়া থাকেন। শিক্ষার দোষে বাঙ্গলার ছাত্র-বর্গের পরিণামে যাহাই ঘটুক না কেন, ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার সকলি আমাদিগের নিকট অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। মানব জীবনের মধ্যে ছাত্রাবস্থাই পরম সুখের সময়। এই সময়ে সংসারের ভাবনা, অর্থ উপার্জ্জনের প্রবল বাসনা, রিপুর প্রখর তাড়না মনুষ্যের হৃদয় ও মনকে অবসন্ন করিয়া তুলে না, মনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে না। মানব জীবনের স্বভাবের শোভা ছাত্র জীবনেই প্রতিফলিত হয়। ছাত্রের মুখের ঐ যে মৃদু মৃদু হাসি,—সরলতাপূর্ণ, কপটতাশূন্য, ভাবনা চিন্তা শূন্য, মানব জীবনের ভাবী উন্নতি স্মরণে, জীবনের উচ্চ আশার স্বপ্নে থাকিয়া থাকিয়া ফুটিতেছে, আবার নিবিতেছে, ইহাতে যে কত গাম্ভীর্য্য, কত সৌন্দর্য্য, তাহা মানব জীবন যাঁহারা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। এখানে প্রবল ঝড়ের পরাক্রম মানবকে সৎপথ হইতে কুপথে নীয়মান করে না, কিন্তু উৎসাহের মৃদুমন্দগতিবিশিষ্ট সুশীতল বায়ু সদাই

জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে থাকে। এই চির-অভিশপ্ত বাঙ্গলার ছাত্র জীবনের পরিণাম যাহাই হউক না কেন, সমস্ত অধিবাসীগণের মধ্যে অধ্যয়নের প্রতি যদি কাহারও অনুরাগ থাকে, তবে সে অনুরাগ ছাত্রদিগের অন্তরে আছে; ঈশ্বর-প্রেম যদি বাঙ্গলার কাহারও হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়া থাকে, তবে ছাত্রের হৃদয়েই পারিয়াছে। দেশের উন্নতির কুহক মন্ত্র যদি কাহার হৃদয় ও মনের শান্তি বিনাশ করিতে পারিয়া থাকে,—দেশের উন্নতির পবিত্র নিঃস্বার্থ চিন্তা যদি কাহারও চক্ষের নিদ্রা ও উদরের ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তবে ছাত্রবর্গেরই পারিয়াছে। আর কত বলিব,—যদি সাধুতা, সচ্চরিত্রতা কাহাকেও মর্ত্ত্যলোকে দেবতা করিয়া থাকে, তবে ছাত্রকেই করিয়াছে। ধর্ম্মের তৃষ্ণায় কাতর, দেশের উন্নতির কামনায় বিহ্বল, ঐ যে যুবক কেবলই পুস্তকের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতেছেন,—চক্ষের দৃষ্টি যাইতেছে, মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য হইতেছে, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই,—উদরে তেমন অন্ন নাই,—মস্তকে তৈল নাই,—শয্যার প্রতি চক্ষু নাই, ঐ যুবক যদি সাধক না হইবেন, তবে এই বিস্তৃত মহাশ্মশানে আর সাধক কে? পৃথিবীর অন্যান্য সাধকদিগকে একদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই সাধক-শ্রেণীকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি, কারণ এই সাধকের হৃদয়ে মৃদু মৃদু ভাবে যে তেজ, যে শক্তি, যে বীর্য্য সঞ্চিত হইতেছে, সময়ে তাহাই দেশের, রাজনীতির জটিল অংশই বল, কিম্বা সমাজনীতির কুসংস্কারের ঘনীভূত অন্ধকারের রাজত্বের কথাই বল, এ সকলকে ভেদ করিয়া উন্নতির বিজয় নিশান গগণে তুলিতে সক্ষম হইবে। আমরা এই সাধক শ্রেণীর আসন,—ঐ যে ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত মলিন আসন, ইহাকেই আদর করিয়া থাকি, কারণ এই আসনের উপর উপবেশন করিয়াই দেশের ভাবী সন্তান কঠিন সমস্যা পূরণের,—দেশের দুর্জ্জয় দুর্গ সকলকে অতল সলিলে ডুবাইয়া কঠিন সমস্যা পূরণের বীজমন্ত্র জপ করিতেছেন। এই হতভাগ্য দেশে বীজমন্ত্রের মর্ম্ম যদি কেহ বুঝিয়া থাকে, তবে ঐ সাধকই বুঝিয়াছেন, নচেৎ এই কপটতাময় জগৎ সংসারে যেমন কথা তেমন কার্য্য করিয়া, অন্তরে যেমন বাহিরেও তেমন ভাব নির্লজ্জভাবে জগৎকে দেখাইয়া ঐ সাধক সরলতা বা বীর্য্যের পরাক্রম দেখাইতে পারিতেন না। ছাত্র-সাধকের ঐ যে অন্তরনিহিত আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মভাব, পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিবে, তুমি আমি ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যে সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেছি না,—বাহির পরিশুদ্ধ করিতে পারিলেও অন্তরের ভাবকে পরিশুদ্ধ করিতে

পারিতেছি না,—বাহিরে নানা প্রকার অসৎ কার্য্য হইতে দূরে থাকিয়াও অন্তরে চৌর্য্যবৃত্তি, ও দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধাদিবৃত্তিকে পোষণ করিয়া হৃদয় ও মনকে মলিন করিতেছি, এবং বাহিরে ধার্ম্মিক নামে খ্যাত হইয়া বাহাদুরি লইতেছি,—এই কপটতা, এই আড়ম্বরসর্ব্বস্ব ধর্ম্মভাব, এই অবিশ্বাসের রাজ্য ঐ সাধকের মধ্যে নাই। এই সাধকই ধার্ম্মিক, কারন বিশ্বাসের জ্বলন্ত বহ্নি ইহার অন্তরেই জ্বলিয়া উঠিতেছে;—এই সাধকই বীর, কারণ ইহার বীরত্ব কথায় নহে, কার্য্যে;—ইহার বীরত্ব সমাজের কুসংস্কারাবৃত তিমির রাশিকে ভেদ করিয়া এক জাতীয়ত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লক্ষ্য প্রতি যখন প্রধাবিত হয়, তখন নেপোলিয়ানই হউন, আর সিজরই হউন, আলেকজাণ্ডারই হউন আর ওয়েলিংটনই হউন, সকলেই এই বীরত্বকে পরাজয় করিতে পরাস্ত হন। পিতা এই সাধক সন্তানের গম্ভীর মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া কম্পিত হন, জননী এই বীরের মুখের ভাব দেখিয়া শঙ্কিত হন;—ইচ্ছা থাকিলেও আর এই বীরকে ফিরাইয়া সংসার আসক্তির পানে ফিরাইতে পারেন না। আমরা যখন এই সাধক শ্রেণীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকি, তখন এই যে অবিশ্বাসীর অন্তর,—এ দেশের কিছুই হইবে না, এদেশ কখনও স্বাধীন হইবে না, এদেশে কখনও ধর্ম্ম স্থায়িত্ব লাভ করিবে না বলিয়া হতাশের সঙ্গীত করিতেছে, এ অন্তর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যায়,—বিশ্বাসের জ্বলন্ত আগুনে অন্তরের সমস্ত অবিশ্বাসের রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যায়! ধন্য এই সাধক-শ্রেণী, কারণ দেশের আশা ভরসা সমস্ত ইহাঁদের জীবনে;—ধন্য এই বীরত্ব, কারণ এই বীরত্বই দেশের অন্ধকারের দুর্জ্জয় রাজ্যকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। উন্নতির সকল প্রকার বীজ ইহাঁদের মধ্যে নিহিত দেখি বলিয়াই আমরা ইহাঁদিগকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষে চিরদুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গলায় এই কঠিন সাধনায় অতি অল্প লোকই আজ পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন! দুঃখের বিষয় এই, এই হতভাগ্য দেশে পর জীবনে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই আপন আসন অটল রাখিতে পারিয়াছেন! দুঃখের বিষয় এই, ছাত্রের বীরত্ব, ছাত্রের চরিত্রের বল, সাধুতার মাহাত্ম্য, সরলতার সুন্দর ছবি, স্বদেশের উন্নতির প্রবল বাসনা, সকলি সংসারের স্রোতে অবগাহন করিবার সময় ভাসিয়া যায়; দুঃখের বিষয় এই, সকল ভাব পরজীবনে স্থায়ী হয় না। যদি তাহা হইত, তবে আর ভাবনা ছিল কি? ঐ যে নব্য উকীল সাজ পোষাক পরিয়া অর্থের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন,—কোন প্রকার উৎসাহ

নাই, দেশের চিন্তা নাই, ধর্ম্মের প্রতি তৃষ্ণা নাই, কত কীট অন্তরে বাস করি-তেছে,—হয়ত রিপুর জ্বালায় কত অন্যায় চিন্তাকেই পোষণ করিতেছেন, ঐযে নব্য উকীল সংসারকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতেছেন, সংসারের মনুষ্যকে ঘৃণার চক্ষে উপেক্ষা করিতেছেন,—সাধুতাকে, ধর্ম্মভাবকে, চরিত্রকে বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন, দেশের উন্নতিকে বাতুল বা যুবকের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, উহাকেই না আমরা এক বৎসর, কি দুই বৎসর, কি তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ঐ ছাত্রদিগের বাসায় কঠোর সাধনায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলাম? উনিই না একদিন বিদ্যাকে জীবনের উন্নতির মূল বলিয়া তাহারই অনুসরণকে জীবনের সার ভূষণ করিয়াছিলেন? হায়, সে সকল আজ কোথায়! আর কত লিখিব?—ঐ যে নব্য ডাক্তার, অর্থের চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে জলের পরিবর্ত্তে কাঞ্চন দ্বারা আপন কোষ পূর্ণ করিতেছেন, এবং রিপুকে চরিতার্থ করিতেছেন, উহাকেও দুদিন পূর্ব্বে ঐ আস্তাকুড়েই দেখিয়া-ছিলাম। আজ সংসারের পাপের রেখা তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্যকে মলিন করিয়াছে বটে, কিন্তু তবু তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি। আর ঐ যে নব্য বিচারক, বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে নবীনের ধন মাধবকে, কিম্বা মাধবের সম্পত্তি নবীনকে দিতেছেন, এবং আইনের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করিয়া আপনার রায় পোষণ করিতেছেন,—আর চিন্তা নাই, আর উৎসাহ নাই, উহাকে আজ সময়ে সময়ে নর্দ্দমায় কিম্বা স্বৈরিণীর পদতলে লুণ্ঠিত দেখিলেও একদিন ঐ আস্তাকুড়েই দেবতা বলিয়া জানিয়াছিলাম; কিন্তু হায়, যে বীজমন্ত্রকে ইনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আজ তাহা কালের সহিত ভাসিয়া গিয়াছে,—এক শিক্ষা প্রণালীর দোষে আজ ইনি দেবত্ব না পাইয়া পশুত্ব লাভ করিয়া বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। এ সকল দুঃখের কথা কেন বলিতেছি, যাঁহারা এই পুস্তক ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা বলিতেছিলাম,—ঐ যে আমাদিগের সকল আশা ভরসার কেন্দ্র,—আস্তাকুড়,—ছাত্রনিবাস। উহার একটী নিবাসে কয়েকটী মেদিনীপুরের, কয়েকটী বরিশালের, কয়েকটী ফরিদপুরের, কয়েকটী ঢাকার ও আর কয়েকটী মৈমনসিংহের ছাত্র বাস করিতেন। বাসার সকলেই পরস্পর সকলকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া থাকেন; কাহার সহিত কাহার বিবাদ বিসম্বাদ নাই, সকলে যেন এক পরিবারের ন্যায় আছেন। ইহাদিগের মধ্যে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, সকলেই সচ্চরিত্র, এই কারণেই পরস্পরকে পরস্পরে বিশ্বাস

করেন,ভক্তি করেন, ভালবাসেন। এই বাসাটী একতার একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি। ইহাদিগের মধ্যে হরিহর নামে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। হরিহরের বাড়ী বিক্রমপুর, কিন্তু বাল্যকাল হইতে হরিহর মাতুল বাড়ীতেই পরিপালিত, স্বদেশ হরিহর কখনও দেখেন নাই। হরিহর পিতাকে জীবনে মাত্র দুই তিন বার দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। হরিহর অতি বিনয়ী, সচ্চরিত্র, সাধু যুবাপুরুষ। বাসার কোন কোন উন্নতমনা ছাত্র হরিহরকে কোন কোন সময়ে ঠাট্টা তামাসা করিলেও হরিহর তাহাতে কখনও বিরক্ত হইতেন না, তিনি জানিতেন বাসার সকলেই তাহাকে বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সকলেই হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন। স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে জাতিভেদ বড় কেহ মানে না, ব্রাহ্মন কায়স্থের সহিত, কায়স্থ ইতর শ্রেণীর সহিত একত্রে আহার করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয়না ; সময় সময় যখন পাচক ব্রাহ্মণ না থাকে, তখন চাকরাণীর পাকেই সকলে আহার করেন। হরিহর কুলীনের সন্তান, প্রথমে এই প্রকার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণ তিনিই অগ্রণী হইয়াছেন, মুসলমানের হাতের অন্ন গ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না। কয়েকটী কারণে হরিহরের মনে বড় একটা স্ফূর্ত্তি ছিল না। প্রথমতঃ হরিহরের পিতা সমস্ত দেশকে যেন বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন,—মাতার সংখ্যা শতাধিক হইবে, ৫ বৎসরের শিশু বালিকা হইতে ৬০।৭০ বৎসরের বৃদ্ধা এই সংখ্যা ভুক্ত। পিতার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইবে না। কত বালিকা, কত যুবতি, কত বৃদ্ধা হরিহরের মাতৃস্থানীয়া! ইহাঁদিগের কত জনের চরিত্রে যে কলঙ্কের রেখা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কেহই গণনা করিতে পারে না। এই কারনে হরিহরকে অনেক লোকের তীক্ষ্ণ সমালোচনার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ হরিহরকে এই নব্য বয়সে আত্মীয় স্বজনের উত্তেজনায় পাঁচটী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে, একটীর বয়স ১৩ বৎসর, একটীর বয়স ২০ বৎসর, একটীর বয়স ১৬ বৎসর, একটীর বয়স ১৮ ও একটীর বয়স ৩৮ বৎসর হইবে। শেষোক্ত দুই ভার্য্যা সহোদরা ভগ্নী। হরিহরের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। হরিহরের মন ঘৃণা ও আত্মগ্লানিতে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত। কুক্ষণে হরিহর কলিকাতায় পাঠার্থ আগমন করিয়াছিলেন, কলিকাতায় না আসিলে তাঁহাকে এত মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হইত না ; সুখে হউক, দুঃখে হউক একভাবে গ্রাম্য জীবন কাটাইতে পারিতেন। কুক্ষণে হরিহর ইংরাজি অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নচেৎ হরিহর বহুবিবাহের

কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া অস্থির হইতেন না। হরিহর অতি কষ্টে কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। হরিহরের একখানি তক্তাপোষ, তাহাতে একখানি তোষক, একটী বালিশ, আহারের জন্য একখানি থালা ও একটী গেলাস মাত্র ছিল; তক্তাপোষের এক দিকে পুস্তক সাজাইয়া একদিকে বসিয়া পড়িতেন। পরিধেয় বস্ত্রাদি শয্যার নিকট দেয়ালে ঝুলান থাকিত;—যখন হরিহরের হৃদয়ে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইত, তখন শয্যায় শয়ন করিয়া বালিশে চক্ষের জল লুকাইতেন। কিন্তু দুঃখ থাকিলেও কলিকাতার ছাত্রের বাসায় হরিহরের সুখ ছিল, একদিকে মনের অসহ্য যাতনা, অপর দিকে বন্ধুবান্ধবের অকৃত্রিম ভালবাসা সর্ব্বদাই হরিহরের হৃদয়ে সুখ দিত। কলিকাতায় কিছু দিন থাকিতে ২ হরিহর বিবাহের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মিল, মনে২ গোপনে একটী প্রতিজ্ঞা করিলেন, সে প্রতিজ্ঞা কেহই জানিল না। হরিহরের মধ্যম স্ত্রীর নাম সুশীলাসুন্দরী, ইনিই হরিহরের প্রিয়; ইনিই মধ্যে ২ হরিহরের নিকট পত্রাদি লিখিতেন। সুশীলা উপযুক্ত সময়ে স্বামীর মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। যাহা হউক স্বামীর নিকট কিয়দ্দিবস মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিহরের ঘরের কথা।

আমরা উপন্যাসের এক অঙ্গ হরিহরের জীবন ও ছাত্রের বাসা বর্ণনায় আরম্ভ করিলাম;—এ কাহিনীতে ইতিহাসের কথা নাই,—অশ্বের পদ শব্দ নাই,—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি নাই,—সৈন্যের তরবারি নাই,—যুদ্ধের পরাক্রম নাই,—বীর পুরুষের প্রণয় নাই,—বীর দুহিতার বিচ্ছেদের ক্রন্দন নাই। অনেক উপন্যাস লেখক ইতিহাসের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া সুন্দর সুন্দর চিত্র বাহির করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন,—প্রতাপসিংহ, শিবজি,

আরঙ্গজীব, আকবর প্রভৃতিকে লইয়া কত ক্রীড়া করেন। কোন কোন উপন্যাস লেখক শুনিয়াছি ইতিহাস সংগ্রহ করিবার মানসে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে দিন দিন যে রাশিকৃত ইতিহাসের কাহিনী সঞ্চিত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে কখনও তাঁহারা ইচ্ছা করেন না; বলেন, ও সকল লিখিলে আর কি হইবে? মাধব কর্ম্মকার, যদু পরামাণিক, গোপাল পুরোহিতের ঘরের কথা লিখিলে দেশের কি হইবে? যুদ্ধক্ষেত্র লেখ, বীরত্ব দেখাও, সৈনিক পুরুষের প্রণয়িনীর অঞ্চল চিত্র কর, পৃথিবী হাসুক, তোমরা অর্থলাভে কৃতার্থ হও। আমাদের কুলীন হরিহরের কাহিনী যে এই প্রকার পাঠকের নিকট শ্রুতিকঠোর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন কোন পাঠক বলেন,—'এ উপন্যাস লেখকটা কেবল প্রণয়ের বিরুদ্ধে কলম চালায়, আর কোন চিত্রই আঁকিতে পারে না।' আমরা বলি যে দেশ প্রণয়ে উচ্ছিন্ন গিয়াছে, সে দেশের প্রণয়ের বিরুদ্ধে লেখাই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য। কেহ বলেন—'এ লোকটা কেবল পরনিন্দা লইয়া রহিয়াছে, দেশের কোন লোকই ইহার নিকট লোকের মধ্যে গণ্য নয়।' আমরা বলি সত্য কথা লেখা আমাদের কর্ত্তব্য, ইহাতে নিন্দা প্রচার হইলেও তাহাই আমরা করিব। কোন কোন পাঠক আমাদিগের কোন কোন চিত্রকে স্বীয় স্বীয় জীবনের সহিত মিলাইয়া আমাদিগের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে, কিম্বা অশেষ প্রকার কষ্ট দিতে একটুও সঙ্কুচিত হন না,তাহারা সাধ্যমত আমাদের অশেষ প্রকার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহারা একবারও ভাবেন না যে,আমরা কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহা করিব বা করিতে প্রবৃত্ত হইব,শরীর যদি বিনষ্ট হইয়া না যায়,তাহা হইলে আর তাহা হইতে আমরা বিরত হইব না। প্রণয়চ্ছবি চিত্র করি না বলিয়া,—যুদ্ধ ক্ষেত্রের বীরের প্রণয়িনীর কাহিনী লিখি না বলিয়া কিম্বা অন্যের জীবনের সত্য ঘটনা লিখি বলিয়া যাহারা বিরক্ত হইয়া আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তায় রত হইয়াছেন, তাহাদের চেষ্টায় আমরা আজ পর্য্যন্তও কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হই নাই, এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কখনও যেন না হই। হতভাগ্য বাঙ্গলার চিত্র উপন্যাসের উপযুক্ত হউক আর না হউক, ইহার চিত্র লিখিলে পরনিন্দা করা হয়, এ কথা লোকে বলুক আর নাই বলুক, আমরা কর্ত্তব্য জ্ঞানে এই হতভাগ্য দেশের কাহিনীকেই উপন্যাসের বর্ণনার বিষয় করিব। প্রতি ছত্র আমরা প্রার্থনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য জ্ঞানে লিখিয়া

থাকি, লোকের ঘৃণা, ঠাট্টা, তিরস্কার বা যন্ত্রণা সহ্য করার ভয়ে আমরা এ পথ হইতে বিরত হইব না। আমাদের পাঠক জুটিবে না, ভয় দেখাও, পুস্তক বিনষ্ট হইবে; আমরা সকল বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইব, ভয় দেখাও, আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা লইয়া থাকিব। লোকে কষ্ট দিবে, ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া সকল যন্ত্রণা ভুলিব। পৃথিবীতে একা আসিয়াছি, একা যাইব, সম্বল কি? লোকের নিন্দা না যশ ঘোষণা, লোকের ভালবাসা না শত্রুতা, লোকের কি? কিছুই না, একমাত্র ঈশ্বর জ্ঞানই সার, তিনিই সম্বল, তিনিই আশ্রয়। কুলীন হরিহরের চিত্র আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রতাপসিংহ অপেক্ষা বর্ণনা করিতে ভালবাসি, কারণ উহা দেশের হৃদয়নিহিত সমস্ত শক্তিকে বিনাশ করিতেছে। আর কি লিখিতে ভালবাসি?—ঐ যে শত সহস্র ভণ্ড তপস্বী দেশের ও সমাজের উপকার করিবার ভান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিয়া ফিরিতেছে, উহাদের জীবনের জটিল কপটতার জাল ছিন্ন করিয়া দেখাইতে ভালবাসি, কারন উহাতে এই হতভাগ্য পরাধীন দেশের অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া মহা অনিষ্ট করিতেছে। সত্য কথা বলিলে, পরনিন্দা হয়, হউক, সে পরনিন্দাকেই আমাদের লেখনীর ভূষণ করিয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের লেখনীর তেমন ক্ষমতা নাই, নচেৎ ইচ্ছা হয়, হৃদয়ের মধ্যে দিন রাত্রি হু হু করিয়া যে সকল চিত্র জ্বলিতেছে,—কত অবলা বিধবার আর্ত্তনাদ, কত স্বামী-পরিত্যক্তা রমণীর হৃদয় যন্ত্রণা, কত কুলীন কুমারীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, কত অবলার পুত্র শোকের ধ্বনি,—কত দরিদ্রের ক্রন্দন, কত অসহায়ের আর্ত্তনাদ,—ইচ্ছা হয় স্পষ্ট করিয়া পরিষ্কারভাবে তাহা জনসমাজকে দেখাইয়া কৃতার্থ হই, মনের যাতনা মিটাই। সে শক্তি নাই, এই আমাদের দুঃখ, সে ক্ষমতা নাই, এই আমাদের মনের খেদ। নচেৎ পাঠকের ভয়ে, বা বন্ধুর ভয়ে, তিরস্কার বা সংসারের যাতনার ভয়ে কখনও আমরা কুলীন অবলার বা বাঙ্গালার বিধবার কষ্ট দুঃখ লিখিতে বিরত হইব না।

সুশীলার জ্যেষ্ঠ সহোদরা জ্ঞানদা, তিনিও হরিহরের স্ত্রী, বয়স ৩৮ বৎসর; দুই ভগ্নী এক রজ্জুতে আপন আপন জীবনের আশা ভরসাকে বাঁধিয়াছেন। জ্ঞানদা বড়ই দুঃখ করেন যে, স্বামী সুশীলাকে ভালবাসেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পারেন না। হরিহরের বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন এক দিনে, এক সময়ে, এক আসনে হরিহর তিনজনকে বিবাহ করেন। সুশীলা, জ্ঞানদা

ও তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়সের ভার্য্যা কাদম্বিনী একদিন স্বামীরত্ন লাভ করেন। কাদম্বিনী তখন শিশু, সুশীলা তখন বালিকা, জ্ঞানদা তখন যুবতী। জ্ঞানদা অশিক্ষিত রমণী—জ্ঞানহীনা, যৌবনের তাড়নায় বিবাহের জন্য একেবারে অস্থির হইয়াছিলেন, মধ্য বয়সে স্বামী পাইলেন বটে, কিন্তু স্বামী নিতান্ত শিশু, যাহাই হউক মন তাহাতেই উৎফুল্ল হইল, হাজার হউক স্বামী পাইয়াছেন, বিবাহের দিন রাত্রেই স্বামীর সহিত ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন। শিশু হরিহর বিবাহের মর্ম্ম কিছুই জানেন না, জ্ঞানদার ঠাট্টায় বিরক্ত হইয়া বাসরঘরেই কাঁদিয়া উঠিলেন। অতি কষ্টে হরিহরের মাতুল হরিহরকে বাসর ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইয়া তাহার মন সুস্থ করিলেন। শিশুর মন সেই দিন হইতেই জ্ঞানদার প্রতি বিরক্ত হইল। বালিকা সুশীলা বিবাহের দিন স্বামীর সহিত কোন কথাই বলেন নাই, কাদম্বিনী দুই এক বার মাত্র কাঁদিয়া সে দিন স্বামীকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কাদম্বিনীও স্বামীর ভালবাসা পাইলেন না, জ্ঞানদাও পাইলেন না। এই কারণে সময়ে সুশীলা ও জ্ঞানদার মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল।

এই এক বৎসর হইল হরিহর কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই এক বৎসরের মধ্যে হরিহরের সকল প্রকার কুসংস্কার ঘুচিয়া গিয়াছে। বিগত বৎসর সমাজের উত্তেজনায় এবং কন্যাভারগ্রস্ত পিতার আগ্রহে হরিহর আবার দুটী বিবাহ করেন, একটীর বয়স ১৩ বৎসর, অপরটীর বয়স ২০ বৎসর। সুশীলার সহিত হরিহরের প্রণয় জন্মিয়াছে;—সুশীলা বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে মন ভরিয়া স্বামীকে ঠাট্টা করিলেন। হরিহরের শিক্ষায় এ পর্য্যন্ত বহু বিবাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে নাই, তিনি আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে আবার দুটী বিবাহ করিলেন। যাহার ১৩ বৎসর বয়স তাহার নাম বসন্তকুমারী, যাহার ২০ বৎসর বয়স তাহার নাম শরৎকুমারী। শরৎকুমারীর সহিত ইতিপূর্ব্বে একটী বংশজ ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল, কিন্তু কুল-মর্য্যাদা ডুবাইয়া দিয়া শরৎকুমারীর পিতা সেই ব্রাহ্মণের সহিত শরতের বিবাহ দিলেন না। হরিহর এসকল কিছুই জানিতেন না। বিবাহের পর ঐ হতভাগিনী শরৎকুমারী সেই ব্রাহ্মণের করে আপন সতীত্ব সঁপে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিবাহের পর কুলীন কন্যাদিগকে প্রায়ই পিত্রালয় পরিত্যাগ করিতে হয় না, শরৎকুমারী পিত্রা-লয়ে আপন জীবনকে কলঙ্কিত করিয়া নারী জাতির চরিত্রকে ম্লান করিতে

লাগিলেন। বসন্তকুমারীও পিত্রালয়ে, কিন্তু তাহার কোন আশঙ্কা নাই, কারণ দুর্জ্জয় রিপুর পরাক্রম জীবনে এখনও আধিপত্য বিস্তার করে নাই।

যে সময়ে হরিহর কলিকাতায় থাকিয়া বিবাহের প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে এইপ্রকারে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী জীবন বিষাদে, কোনটী বা কলঙ্কের বোঝা মস্তকে করিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। এই পাঁচ জনের মধ্যে সুশীলাই প্রকৃত সুখী, স্বামীর মন তাহাতেই অনুরক্ত। জ্ঞানদা ও কাদম্বিনী হতভাগিনী, কারণ স্বামীর মুখের মধুর সম্ভাষণ কখনও তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে নাই। জ্ঞানদা সতিন ভগ্নী সুশীলার প্রতি বিষ নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া আছেন।

হরিহর কি প্রকার বিপদগ্রস্ত, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। পাঁচটী জীবনের কুল-মান, সতীত্ব রক্ষা ও ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞান চক্ষে যখন এই ভাবটী হরিহর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন, তখন তাহার হৃদয় কি প্রকার চঞ্চল হইল, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। পাঁচজনকে হৃদয় কি প্রকারে বিভাগ করিয়া দিবেন, কি প্রকারে একপ্রাণে পাঁচজনের মনতুষ্ট করিবেন, কর্ত্তব্য জ্ঞানের এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যখন হরিহর অক্ষম হইলেন, তখনই ইহার মন বিবাহের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; তিনি কর্ত্তব্যের কঠোরভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুশীলার নিকট পত্রাদি লেখা বন্ধ করিলেন। স্বামীর এই ব্যবহারে সতী সুশীলা মর্ম্মে আঘাত পাইলেন, মুখ মলিন হইল। জ্ঞানদা সুশীলার ভাব কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল, বেশ হয়েছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্বিন মাসে নদী স্রোতে।

আশ্বিন মাসে, শারদীয় পূজার অবকাশে, কলিকাতার কোন কোন ছাত্র-নিবাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। যদিও পূজার সময় স্কুল কলেজ প্রভৃতি

মাত্র দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকে, কিন্তু বঙ্গের এই আনন্দের সময় অনেকেই দূরদেশে থাকিতে ইচ্ছা করেন না, বৎসরান্তর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বাড়ীতে গমন করেন। অগ্রহায়ণ মাসে ও জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল প্রভৃতি অনেক দিন বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু সে সময়ে ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে তত আনন্দ হয় না। আশ্বিন মাস বাঙ্গলার একটী বিশেষ আনন্দের সময়। এই সময় চিন্তনে, এই সময় স্মরণে প্রবাসবাসীদের অন্তরে আনন্দ প্রবাহ ছুটিতে থাকে। সমস্ত বৎসর বাঙ্গলার অধিবাসীগণ এই সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বাস্তবিকই বাঙ্গলার এই এক সময়! সমস্ত বৎসরের মধ্যে এমন সুন্দর সময় আর নাই। প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ প্রশমিত হইয়া অল্পে অল্পে দক্ষিণ গগণে হেলিয়া পড়িতেছে, গ্রীষ্মের পরাক্রম ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, বর্ষার জল আনন্দে ফাঁপিয়া উঠিয়া গ্রামের গৃহ সকলকে, বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিতেছে,—ক্ষুদ্র খাল, বৃহৎ নদী, ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বৃহৎ দীর্ঘিকা, সমস্ত আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছে,—নৌকা তাহাতে বুক দিয়া গ্রামবাসীদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বিচরণ করিতেছে। এক দিকে এই দৃশ্য, অপর দিকে বৃক্ষ সকল তেজে মাতিয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার ক্ষেত্র ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সমস্ত বাঙ্গলা সবুজ বর্ণের সাজ পরিধান করিয়াছেন,—জলাশয়ে পদ্ম ও শালুক, স্থলে স্থলপদ্ম ও শেফালিকা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। সেই ফুল যখন বিল্বপত্রের সহিত শিব-পূজার অব্যবহিত পরে জলে ভাসিয়া যাইতে থাকে, তখন তাহা দেখিতে কত মধুর বোধ হয়। আশ্বিন মাসে বাঙ্গলার পূর্ণ যৌবন, কত আনন্দ, কত প্রবাহ, কত সুখ, কত শোভা! রজনীতে গগণে চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি জলের উপরে, শস্যের উপরে খেলা করিতেছে, মৃদুমন্দ গতিতে পবন সেই জ্যোতির সহিত খেলা করিতে করিতে, জলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে শরীরকে শীতল করিতেছে; দূর হইতে বীণার ধ্বনি, কি নাবিকদিগের সঙ্গীতের প্রবাহ ধীরে ধীরে জলের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিতেছে; বাঙ্গলার যাহারা এ সুখের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহারা আশ্বিন মাসে আর সহরে থাকিতে বাসনা করেন না। প্রকৃতির রাজত্বের উপরে আবার মানুষের রাজত্ব, দুর্গোৎসব আগমনে পুরোহিতগণ পাঁজিপুথি হাতে লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, ঢাকিরা ঢাক কাঁধে লইয়া শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছে; বালক বালিকাগণ নূতন বসন ভূষণে

সাজিয়া বাড়ী বাড়ী প্রতিমা দেখিতেছে; দশভুজা মন্দিরে অধিষ্ঠান হইয়াছেন। হাট বাজারে কত নূতন নূতন দ্রব্য বিক্রীত হইতেছে, আজ অধিবাস, কাল প্রথম পূজা, কত নৌকা ক্রমে ক্রমে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেছে। বাঙ্গলার সকলের হৃদয়ে আনন্দ প্রবাহ, সকলের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা চলিয়া গিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গলার আনন্দ গ্রামের অধিবাসীগণ প্রচার করিতেছেন। বাঙ্গলার আশ্বিন মাসের আনন্দের সীমা নাই। বিচ্ছেদের পর মিলনে পুরুষ ও রমণীর হৃদয়ে কি প্রকারে আনন্দ প্রবাহ কেলি করে, দেখিতে চাও, ঐ বাঙ্গলার গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় গমন কর। সমস্ত বৎসর কঠোর তপস্যার পরে যুবতী স্বামীর সহিত মিলিয়াছেন; সমস্ত বৎসর নয়নাশ্রুতে ভাসিয়া সময় কাটাইয়া বৎসরান্তে ঐ পুত্রবৎসলা জননী পুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন;—সমস্ত বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া ঐ যুবক জননীর ক্রোড়, প্রণয়িণীর অঞ্চল পাইয়াছেন। ভ্রাতৃমিলন, বন্ধুমিলন স্বামী স্ত্রীর মিলন, জনক-জননী ও পুত্রের মিলন, কত সুখ, কত আনন্দ! যাঁহারা বারমাস নিরানন্দের মধ্যে রহিয়াছেন, হৃদয়ের প্রফুল্লতা ও নয়নের কোণে আনন্দের হাস্য যাহারা কখনও দেখেন নাই, তাহারা একবার আশ্বিন মাসে বাঙ্গলার পল্লীতে গমন করুন। হায়, বার মাস যাহারা নগরের নিরানন্দের নীরস কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া কর্ণকে বধির করিল, বারমাস কেবল মনুষ্যের কারুকার্য্য দেখিয়া দেখিয়া চক্ষুকে অন্ধ করিল, তাহারা আর বাঙ্গলার সুখ ঐশ্বর্য্য কি ভোগ করিল!!

হরিহর যে বাসায় থাকিতেন সে বাসা পূজার সময় শূন্য হইল,—ছাত্রগণ পাঁজিপুথি গুটাইয়া, আফিস তুলিয়া কেহ নৌকায় ভাসিলেন, কেহ রেলগাড়ীতে উঠিলেন, দেখিতে২ বাসা শূন্য হইল, ঝি ও পাচক ব্রাহ্মণ অবসর পাইল। যাহারা ছাত্রদিগকে বাড়ীভাড়া দেয়, তাহাদিগের প্রায়ই আশ্বিন মাসের ভাড়া মিলে না; মৌচাকে আগুন লাগাইলে যেমন মৌমাছি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, মৌচাক শূন্য হয়, পূজার হাওয়া লাগিলে কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলিরও ঠিক সেই দশা ঘটে। আশ্বিন মাসে স্কুল কলেজ বন্ধ হইলে সকলেই ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে, কে বা ভাড়া দেয়, কে বা কার পানে তাকায়, স্কুল বন্ধ হইলে দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাসাগুলি শূন্য হইয়া পড়ে। হরিহরের দেশে যাইবার তত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সকলেই যখন দেশের দিকে ছুটিল, বাসা যখন শূন্য-হইল, তখন তাহার মন কেমন করিয়া উঠিল, তিনিও দেশের দিকে চলিলেন।

দেশ কোথায়? পাঠক জানেন, হরিহর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই খানেই হরিহরের সকল আসক্তি নিহিত রহিয়াছে, তিনি পুস্তক, তোষক বালিশাদি বাঁধিয়া মাতুলালয়ের দিকে চলিলেন। হরিহরের মাতুলেরা বংশজ ব্রাহ্মণ, অবস্থা ভাল, সেই মাতুল বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে হরিহরের মধ্যম স্ত্রী সুশীলা থাকিতেন। এবৎসর অনেক দিন হইল সুশীলা পিত্রালয়ে গিয়াছেন,—সমস্ত বৎসর কত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন,সে সকল এই আশ্বিন মাসেক্রমে ক্রমে ভুলিতেছেন,—হৃদয়ের মধ্যে যেন আনন্দের লহরী ছুটিতেছে। একদিন, দুদিন করিয়া দিন গণিতেছেন, এক এক দিন কালের অনন্ত সাগরে বিলীন হইতেছে, আর সুশীলার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। স্বামীর মুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন,এই আশায় সুশীলা আহ্লাদে ভাসিতেছেন।

দিন চলিতে লাগিল, পূজার দিন নিকটে আসিল, হরিহর একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া মাতুলবাড়ী রওনা হইলেন। জোয়ারে জোয়ারে ভাঁটায় ভাঁটায় অনেক খাল, অনেক নদী অতিক্রম করিয়া হরিহরের নৌকা মাতুলবাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; হরিহরের মনে তত আনন্দ নাই, নানা প্রকার চিন্তায় মন অবসন্ন,সুশীলার সহিত দেখা করিয়া যাইতে এক একবার ইচ্ছা হয়, আবার মনের গতিকে প্রশমিত করিয়া রাখেন। সুশীলার পিত্রালয় লক্ষ্মী-পাশা, লক্ষ্মীপাশার নিকট দিয়াই হরিহরের নৌকা যাইবে। লক্ষ্মীপাশার নিকটে হরিহরের নৌকা যখন আসিয়া পৌঁছিল, তখনও হরিহর কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই, তখন প্রায় এক প্রহর রাত্রি হইয়াছে। মাঝীদিগকে তীরে নৌকা বাঁধিতে বলিয়া হরিহর আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, মাঝীরা সমস্ত দিন মধুমতীর এবং আঠারবেকীর একটানা স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, এখন শরীর অবসন্ন হইয়াছে, আহারের পরই তাহাদের চক্ষের উপর নিদ্রা আসিয়া রাজ্য বিস্তার করিল, তাহারা মৃতের ন্যায় নৌকায় পড়িয়া রহিল। দুপ্রহর রজনীর পর যাহা ঘটিল তাহা লিখিতে শরীর কাঁপিয়া উঠে। এক দল দস্যু হরিহরের নৌকার বন্ধনীর দড়ি কাটিয়া দিলে নৌকা মধুমতীর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূরে চলিল। নিস্তব্ধ পৃথিবী,—নদীর মধ্যস্থান, জন প্রাণী রহিত, আকাশে কেবল নক্ষত্র-মণ্ডলী মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, কেবল স্থানে স্থানে মেঘ অনন্ত আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়াছে, নৌকা ঘুরিতে ঘুরিতে ছুটিয়াছে। এমন সময়ে হঠাৎ ডাকাতেরা নৌকায় পড়িয়া সকলকে প্রহার করিতে আরম্ভ

করিল। মাঝীরা কেহ আঘাত খাইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ বা নৌকায় অচেতন হইয়া রহিল, হরিহর আর উপায় না দেখিয়া মধুমতীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, দস্যুরা নৌকায় অধিক কিছু না পাইয়া বিষণ্ন হইয়া ফিরিয়া গেল ; নৌকা সেই অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

হরিহর সন্তরণে পটু ছিলেন বটে, কিন্তু বড় নদীর মধ্যে পড়িয়া সাঁতার দিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টার ন্যায় মূর্খতা আর কিছুই নাই ; কারণ সাঁতার দিতে২ হস্ত পদাদি অবসন্ন হইয়া পড়িলে আর জলের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে না। হরিহর ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, তিনি কেবল জলের উপরে ভাসিয়া রহিলেন, প্রবল স্রোত তাহাকে বিদ্যুতের ন্যায় লইয়া চলিল। ক্ষণকাল এই প্রকার যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহার শরীরে তৃণাদি লাগিতে লাগিল, তিনি অনুমানে বুঝিলেন কোন চড়ার উপর দিয়া তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া তৃণের ঝোপ ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুই তিনবার কৃতকার্য্য হইলেন না, তৃণ ছিড়িয়া আসিতে লাগিল, প্রবল স্রোতের গতিকে বাধা দিয়া স্থির হইতে পারিলেন না। তাহার মনে ভয় হইতে লাগিল, আবার যদি চড়া অতিক্রম করিয়া নদীতে পড়েন, তবে আর বাঁচিবার আশা নাই, ইহা ভাবিয়া কতকগুলি তৃণের ঝোপ দুই হাতে ধরিলেন, স্রোত পরাস্থ হইল, তিনি মৃত্তিকা পাইলেন, সে স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন গলা জলের অধিক জল নাই। নদীতে ভাসিতে ভাসিতে শরীর অবসন্ন হইয়াছে, শীতে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে, এই অবস্থায় এই গভীর রাত্রে কোথায় যাইবেন ? মধুমতীর তীরে উঠিতে আর কি তাঁহার সাহস হয় ? জলে প্রাণ বাঁচাইয়া আর কি তীরে উঠিয়া দস্যুর হস্তে পড়িতে ইচ্ছা হয় ? পূজার সময় দস্যুরা অর্থের লালসায় ক্ষিপ্ত প্রায় হয়, কারণ এই সময়ে যদি তাহারা কিছু না পায়, তবে সমস্ত বৎসর আর পাইবার বড় আশা থাকে না। যে যাহা সঞ্চয় করিয়াছে পূজার সময় সকল লইয়া বাড়ী চলিয়াছে, দস্যুরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার এই এক মাসের সমস্ত নদীর ঘটনা সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে শরীর কম্পিত হয়, বাঙ্গলাকে অরাজক দেশ বলিয়া বোধ হয়। এতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ইংরাজের হস্তে গিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দস্যুর ভয় যায় নাই। মিসরে জয় পতাকা উড্ডীন করা কিম্বা জুলুরাজ্যে শান্তি স্থাপন করা সহজ কথা, কিন্তু বাঙ্গলার নদীকে নিরাপদ করিয়া পথিকদিগের হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নাই।

হরিহর আর উপায় না দেখিয়া তীরে উঠিলেন, জলে আর থাকিতে পারেন না, কারণ প্রতিকূল স্রোতে গা লাগাইয়া যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই, হস্তপদাদি অবশ ;—দস্যুদিগের হস্তে প্রাণ দিতে তীরে উঠিলেন। তীরেও হরিহরের নিস্তার নাই, সেখানেও দক্ষিণের বায়ু মৃদু মৃদু বহিয়া শরীরকে কম্পিত করিতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, হরিহর অনুমানে বুঝিলেন। তিনি আস্তে আস্তে পদ সঞ্চালন করিয়া গ্রামের দিকে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শুনিলে শরীর উষ্ণ হয়।

তারপরদিন হরিহরের আর ভাবিবার সময় রহিল না, হরিহরের বস্ত্রাদি সমস্ত গিয়াছে, আহারের কিছুই নাই, তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া লক্ষ্মীপাশা যাইতে মনস্থ করিলেন। সুশীলার বড় সৌভাগ্য, স্বামীর সহিত বুঝি তবে দেখা হয়। পরদিন হরিহর হাটিয়া লক্ষ্মীপাশা সুশীলাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সুশীলার আনন্দের সীমা রহিল না, জ্ঞানদা বড়ই বিষন্ন হইলেন।

হরিহর সুশীলার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট গত রাত্রের সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন। হরিহরের কষ্ট যন্ত্রণা দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ে দুঃখের উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল, তাহারা বুঝিল হরিহরের নৌকাই তাহারা পূর্ব্ব রজনীতে লুণ্ঠন করিয়াছে। এক্ষণ উপায় কি, হরিহর যদি সমস্ত জানিতে পারে, তবে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, এই সকল চিন্তায় তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল ; হরিহর কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু তাহার অজ্ঞাতে অনেক প্রকার পরামর্শ ভিতরে ভিতরে চলিতে লাগিল।

সুশীলার চারি সহোদর, ইহারা চারিজনেই দস্যুবৃত্তিতে বিশেষ পটু, পিতা পুত্রে মিলিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা গৌরবের সহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ইত্যাদি করিয়া

সুখ সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুশীলার মাতা উপযুক্ত গৃহিণী, তিনি আহ্লাদে স্বামী পুত্রের উপার্জ্জনের ধনে গৃহকে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন। সুশীলা বাল্যকাল হইতে এই সকল ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন প্রকারে সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ সকলেই সুশীলার বিরোধী। সুশীলা স্বামীর নিকট কখনও এ সকল কথা ব্যক্ত করেন নাই, মনে ভাবেন স্বামী এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। জ্ঞানদা পিতা মাতার মনের মেয়ে, কারণ জ্ঞানদা এসকলই ভাল বাসেন। জ্ঞানদা এবার সুখের ঘর বাঁধিয়াছেন! লিখিতে লজ্জাও করে, না লিখিলেও নয়, জ্ঞানদা যৌবনের উত্তেজনায়, পিতা মাতার ইঙ্গিতে এবার সুখের ঘর বাঁধিয়াছেন। অবোধ রমণী, সংসারের ধর্ম্মাধর্ম্ম কি জানেন, কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছেন,জীবনকে কলঙ্কের পথে চালাইয়া দিয়া সুখে আছেন,—জ্ঞানদার এবৎসর সন্তান হইবার কথা। এতদিন আজ কাল করিয়া গিয়াছে, হঠাৎ হরিহর শ্বশুরালয়ে আগমন করিবেন, কাহারও এ ধারণা ছিল না, নচেৎ এত দিন জ্ঞানদা কলঙ্কের বোঝা মস্তক হইতে নামাইয়া রাখিতে পারিতেন;—নচেৎ এত দিন জ্ঞানদা সতীকুলের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিতেন। আজ স্বামীর আগমনে জ্ঞানদা বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, কোথায় কলঙ্ক মুখ লুকাইবেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বাড়ীতে গুপ্ত পরামর্শের স্রোত চলিতেছে, হৃদয়ঙ্গম করিয়া জ্ঞানদা একটু প্রফুল্ল হইলেন, তিনি আহ্লাদে সেই পরামর্শে যোগ দিলেন।

সুশীলা এই কলঙ্কের মধ্যে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এই পৃথিবীতে সুশীলার কি জন্মগ্রহণ করিবার আর স্থান ছিল না? আমাদের একটী আশঙ্কা হইতেছে, পাছে পাঠকগণ সুশীলার জন্মের তত্ত্ব জানিয়া ইহার প্রতি বিরক্ত হন। সংসারে অনেক সময়েই বংশ দ্বারা স্বভাব পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, সুশীলাকে সেই তুলদণ্ডে পরীক্ষা করিলে দুঃখের সীমা থাকিবে না; সুশীলা কেন এই দস্যুর গৃহে জন্মিয়াছেন, তাহা আপনিও বুঝিতে পারেন না, ইহাদের জঘন্য ব্যবহারে তিনি মৃতের ন্যায় আছেন।

সুশীলার অজ্ঞাতসারে পরামর্শ ধার্য্য হইল, সেই দিন রাত্রেই হরিহরকে হত্যা করা হইবে। পূর্ব্ব রাত্রে পিতা পুত্রে হরিহরের নৌকা লুণ্ঠন করিয়াছে, সে কলঙ্ক ঢাকিবার আর উপায় নাই, সুশীলার সহিত দেখা হইলে হরিহর সকলই জানিতে পারিবে, ইহা মনে করিয়া সকলে ঠিক করিল

হরিহরের সহিত সুশীলাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। বাড়ীতে প্রচার হইল, জামাই কল্য কষ্ট ও যন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া আসিয়াছেন, অদ্য বাহির বাড়ীতেই থাকিবেন, কল্য সুস্থতা লাভ করিয়া অন্তঃপুরে বাস করিবেন। হরিহর এবং সুশীলা ভিতরের সংবাদ কিছুই জানেন না, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে আছেন। অপরাহ্নে সুশীলার জননী জ্ঞানদার নিকট সকল বিবরণ শুনিলেন; তিনি বলিলেন,—বেশ পরামর্শ হয়েছে, কিন্তু একবার সুশীলার সহিত হরিহরকে জন্মের মত দেখা করিতে দাও।

এ কথা শুনিয়া জ্ঞানদা বলিল,—মা, সে কি, তুমি কি আমার ভাল মন্দ দেখিবে না? পুত্রদিগের ভবিষ্যৎ দেখিবে না? তা কখনই হবে না, সুশীলা জানিতে পাইলে আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হবে।

জননী বলিলেন,—একবার মাত্র দেখা হলেই আমি সুশীলাকে ডেকে আন্‌ব, তারপর তোমরা ভাই ভগ্নী মিলে যাহা হয় করিও।

জননীর ভয়ে জ্ঞানদা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাড়ীতে আবার সংবাদ ঘোষিত হইল, জামাই রাত্রে অন্তঃপুরেই থাকিবেন। সুশীলার জননী পুত্রবধূদিগকে আদেশ করিলেন,—তোমরা জন্মের মত আজ সুশীলাকে অলঙ্কারাদি পরাইয়া, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া, ভাল কাপড় পরাইয়া রাখ, কিন্তু প্রাণান্তেও সুশীলার নিকট সকল ভেঙ্গে বল্‌বে না। আদর্শ পরিবারের আদর্শ পুত্রবধূ সকলে মিলিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইল। একটী বধূ সুশীলাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার পা আর উঠে না, কি করিবেন, শাশুড়ীর তাড়নার ভয়ে জড়সড় হইয়া চলিলেন। সুশীলার নিকটে সকলে যখন অগ্রসর হইল, তখন সুশীলা বলিলেন, আজ তোমাদিগের এত আগ্রহ দেখি কেন? কেহ বলিল,—বহুকাল পরে আজ জামাই বাবু এসেছেন, তাই তোমাকে সাজাইয়া দিতে এসেছি। কেহ বলিল,—তোমার সুখের দিন, তা আমাদের কি আমোদ কর্‌তেও নেই?

এই বলিয়া কেহ অলঙ্কার পরাইয়া দিতে লাগিল, কেহ বা চুল বাঁধিয়া দিতে লাগিল, কেহ বা কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিতে লাগিল, এই প্রকারে সকলে সুশীলাকে জন্মের মত সাজাইতে লাগিল। যে বধূ সুশীলাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তিনি হঠাৎ বলিলেন, আর ইচ্ছা করে না,—ছাই সিন্দুরের ফোঁটা দিলে কি হবে!

এই কথা শুনিয়া অন্য সকলে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলে তিনি আপনার কথাকে ফিরাইয়া লইলেন; সকলে সুশীলাকে সাজাইয়া প্রস্থান করিল। সুশীলার মন ভার ভার বোধ হইতেছে, সমস্ত বাড়ীতে যেন কেমন এক প্রকার ভাব বোধ হইতেছে, কেহই মন খুলিয়া সুশীলার সহিত কথা বলে না, কেহই সুশীলার নিকটে ঘেসে না। সুশীলার মন আজ কেমন কেমন করিতেছে।

সন্ধ্যার সময় যেন সুশীলার নিকটে দৈববাণী হইল, কোন নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া সেই বধূ সুশীলার নিকট সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সুশীলা সকল কথা শুনিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, অধিক বিলম্ব নাই, ইহার মধ্যেই উপায় করিতে হইবে, নচেৎ চিরকালের জন্য স্বামীকে হারাইবেন, এই ভাবনায় অস্থির হইলেন। হঠাৎ তাহার একটী উপায় স্মরণ হইল; তিনি স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোথায় সুশীলা স্বামীর সহিত এতদিন পরে মন ভরিয়া কথা বলিবেন, কোথায় আজ স্বামীর সহিত সুখ দুঃখের বিনিময় করিয়া কৃতার্থ হইবেন, না আজ তাহাকে গোপনে পলাইয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন, ইহাই চিন্তা করিতেছেন। সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরেই হরিহরকে সুশীলার গৃহে যাইতে আদেশ করা হইল, হরিহর যখন সুশীলার গৃহে আসিলেন, তখন বাড়ীর সমস্ত লোক বাহিরে যাইয়া সকল প্রকার আয়োজন করিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, তুমি অগ্রে আঘাত করিবে, কেহ বলিতে লাগিল, তুমি অগ্রে। জ্ঞানদা বলিয়া উঠিলেন, যদি কেহ না পার, তবে আমিই আগে আঘাত করব।

সুশীলার গৃহে যখন হরিহর প্রবেশ করিলেন, তখন সুশীলার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল, চক্ষু হইতে যেন অগ্নি নির্গত হইতেছিল।

হরিহর গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কাঁপিতেছ কেন? আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ?

অতি কষ্টে সুশীলার কম্পিত অধর হইতে স্বর বাহির হইল, বলিলেন,—ভয়ে? তাহা নহে, আর অধিক বিলম্ব নাই; কল্য রাত্রে আমার পিতা ও ভ্রাতারা তোমার নৌকায় দস্যুবৃত্তি করিয়াছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, অদ্য তোমাকে হত্যা করিবেন, তাহারই আয়োজন হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই, আজ আর কিছুই বলিতে পারিব না, যদি বাঁচিয়া থাকি, এবং আজ তুমি যদি রক্ষা পাও তবে ভবিষ্যতে সকল বলিব; আজ এই পথে যাও, ঐ যে পায়খানা দেখিতেছ, উহার ধার দিয়া ঐ অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া যাও,

সম্মুখে যে পুলিস থানা দেখিবে, ঐ থানায় প্রাণান্তেও যাইবে না, কিম্বা নিকটে কোন গৃহস্থের বাড়ীতেও যাইবে না, আজ সমস্ত রাত্রি একদিকে হাঁটিয়া যাও, দৌড়্ দিও না, নির্ভয়ে যাও।

হরিহরের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বলিলেন, তুমি এতদিন তোমার বাড়ীর এসকল কথা বল নাই কেন?

সুশীলা বলিলেন, কুলীনের ঘরের কত কাহিনী তোমাকে বলিব? তোমার স্ত্রী জ্ঞানদা আমার ভগ্নী, তাহার সন্তান হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে বলিয়াই তোমার এ দশা ঘটিল, নচেৎ দুই চারিদিন হয়ত এখানে থাকিতে পারিতে? তুমি বালক বইত নও, তোমাকে কত কথা বলিব?

হরিহরের হৃদয় মন ক্রোধে, ভয়ে, ঘৃণায় অবসন্ন হইল; তিনি শ্বশুরবাড়ীর সুখকে বিষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেই রজনীতে সুশীলার কথিত পথে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলঙ্কিণীও সময় পায় ?

সেই রজনীতে পলায়ন করিয়া হরিহর লক্ষ্মীপাশার নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সুশীলার নিষেধের কোন কারণ খোঁজিয়া পাইলেন না; কলিকাতা হইতে টাট্‌কা আসিয়াছেন, গ্রাম্য পুলিসের কিছুই জানেন না। সুশীলা যতই আত্মীয় ভাবে ব্যবহার করুন না কেন, সুশীলার প্রতিও হরিহরের সন্দেহ হইতে লাগিল, সুশীলা বলিয়াছিলেন থানায় যাইও না, হরিহর মনে ভাবিলেন, থানার লোকেরা জানিলে সুশীলার পিতা এবং সহোদরেরা বিপন্ন হইবে মনে করিয়া সুশীলা থানায় যাইতে নিষেধ করিয়াছে। হরিহর সে কথা সন্দিগ্ধ মনে উপেক্ষা করিয়া থানায় উপস্থিত হইলেন। উপযুক্ত থানার উপযুক্ত লোকেরা হরিহরকে বসিতে বলিয়া গোপনে দস্যুদিগের বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইল।

এ দিকে সুশীলা একাকিনী গৃহে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রতি

মুহূর্ত্তে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই রাত্রি নিরাপদে প্রভাত হইলে যেন সুশীলা জীবন লাভ করেন; কিন্তু তাহাও কি হইবে? প্রায় দেড় প্রহর রজনীতে সুশীলার জননী আসিয়া সুশীলাকে ডাকিলেন, সুশীলা দুই তিনবার যাইতে অস্বীকার করিয়া অবশেষে মাতার কথানুসারে ঘরের বাহির হইলেন। বাহির হইবা মাত্র জ্ঞানদা শাণিত অস্ত্র হস্তে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে অপর ভ্রাতারা চলিল; গৃহ অন্ধকার, কেবল দরজা দিয়া একটু বাহিরের আলো গৃহের শয্যার উপর পড়িয়াছিল। সুশীলা বালিশ প্রভৃতি গুলিকে এমন ভাবে শয্যার উপর ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেই যেন একজন লোক শয্যায় শুইয়া আছে বলিয়া ভ্রম হয়। জ্ঞানদা গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপরিস্থিত বালিশ গুলিকে স্বামীভ্রমে আঘাত করিবেন বলিয়া যাই অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা জ্ঞানদার পিতা ডাকিয়া বলিলেন,—চল্, সন্ধান পাইয়া জামাই পলাইয়া গিয়া থানায় আবদ্ধ হয়েছে, চল।

জ্ঞানদা ও অপর সকলে ক্রোধে অধীর হইয়া থানার দিকে চলিল, পথে সকলে ঠিক করিল সুশীলাই চক্রান্তের মূল। থানায় উপস্থিত হইলে থানার বড় কর্ত্তা বলিলেন, আমার হাতে ধরা পড়েছে বলে তোমরা রক্ষা পাইলে, নচেৎ এবার তোমাদের সর্ব্বনাশ হতো। সুশীলার পিতা ইঙ্গিতে বলিলেন,— কল্য কিছু পাঠাইয়া দিব। জ্ঞানদা হাসিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন,—তুমি যে কাজ করেছ তাতে তোমার স্বার্থ পূর্ণ হইলেও সে জন্য অবশ্য পুরস্কার পাবে! বড় কর্ত্তা মৃদু ২ হাসিয়া জ্ঞানদার কথাকে গ্রহণ করিলেন, পরে বলিলেন,—আপনারা এক কাজ করিবেন,—ইহাকে হত্যা করিবেন না, কারণ হত্যাকাণ্ড গোপন করা কষ্টকর হইয়া উঠে, রক্ত প্রভৃতি মৃত্তিকায় পড়ে থাকে, লাশ লইয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়; আপনারা ইহার হস্ত পদাদি দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া মধুমতীতে ডুবাইয়া দিয়া আসুন। জ্ঞানদা দুই একবার হস্তের অস্ত্র তুলিয়া বলিলেন,--তবে এ অস্ত্র কি বৃথা এনেছি, অবশ্য সাধ মিটাব। আর আর সকলে বলিল, না, হত্যা করে কাজ নাই, নদীতে ডুবাইয়া দেওয়াই ভাল। এই পরামর্শ ধার্য্য করিয়া হরিহরকে থানার গৃহেই দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া সকলে ধরাধরী করিয়া নদীর দিকে লইয়া চলিল; জ্ঞানদা একটা কল্‌সী লইয়া চলিলেন।

তবে কি হরিহর জন্মের মত চলিলেন? পাষাণ হৃদয়া জ্ঞানদা মধ্যে মধ্যে

সুশীলার কথা বলিয়া হরিহরকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন ;—এমন সাধের স্বামী থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, আজ সুশীর সুখের হাট ভেঙ্গে দিয়া সাধ মিটাব। হরিহর ভাবিতেছেন, একেবারে মৃত্যু হইলেই বাঁচিতাম, থকিয়া থাকিয়া আঘাত পাওয়ার অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল।

এদিকে পূর্ব্ব রজনীতে হরিহরের লুণ্ঠিত নৌকা মাত্র একজন আহত মাজীকে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিল। পথে একখানি ডিটেক্‌টিভ পুলিসের নৌকা, এবং একখানি ম্যাজেষ্ট্রেটের নৌকা তীরে সংলগ্ন ছিল। সেই সময়ে মধুমতীতে এত ডাকাতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, পুলিসের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া স্বয়ং ম্যাজেষ্ট্রেট তদারকে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরিহরের নৌকা খানি ঘুরিতে ঘুরিতে যাইতেছিল, ইহা দেখিয়াই ম্যাজেষ্ট্রেটের নৌকার লোকেরা দস্যু লুণ্ঠিত নৌকা বলিয়া বুঝিল। সেই নৌকাখানি ধরিয়া আনিলে আহত মাজীর নিকট সকল বিবরণ শুনিয়া ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেব বড়ই অপ্রতিভ হইলেন ; তিনি নদীর ভিতরে থাকিতেই এই প্রকার ডাকাতি হইতেছে, ইহা জানিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, পরদিন সন্ধ্যার সময় গোপনে, যে স্থানে দস্যুরা নৌকা লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহার নিকটে আপন নৌকা বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরিহরের পরম সৌভাগ্য যে থানার বড় কর্ত্তার পরামর্শে তাঁহাকে নদীতে ডুবাইয়া দিবার জন্য সকলে ধরাধরী করিয়া নদীর ধারে আনিতেছিল। ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেবের নৌকা নদী তীরস্থ একটী ঝোপের নিম্নে লুক্কায়িত ছিল। দস্যুরা সেই স্থান দিয়া হরিহরকে ধরাধরী করিয়া আর একটু দূরে যাইতেছিল ; এমন সময়ে ম্যাজেষ্ট্রেটের লোকেরা ঐ ব্যাপার দেখিয়া পুলিসের নৌকায় সংবাদ দিল। পুলিসের নৌকা বিষম দায়ে বাঁধা পড়িয়াছেন, কোথায় পূজার সময় কিছু উপার্জ্জন করিবেন, না ম্যাজেষ্ট্রেটের সঙ্গে মিলিয়া ডাকাত ধরিবার পথ খোঁজিতে হইতেছে। পুলিসের নৌকার লোকেরা প্রথমে, গ্রামের লোকেরা শব দাহ করিতে যাইতেছে বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে ম্যাজেষ্ট্রেটের লোকেরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় অবশেষে তীরে উঠিল। তখন আর ঢাকিবার যো ছিল না, ম্যাজেষ্ট্রেট গোলমাল শুনিয়া নৌকার বাহিরে আসিলেন, পুলিস অগত্যা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথায় যাইতেছ ?

হরিহরের মুখ আবৃত থাকিলেও এক প্রকার শব্দ করিতেছিলেন, সেই শব্দ শুনিয়া ম্যাজেষ্ট্রেট একেবারে তীরে উঠিয়া নিকটে গেলেন। পুলিসের কথা

শুনিয়া প্রথমে দস্যুদের মনে আনন্দ হইয়াছিল,কিন্তু যখন ম্যাজেষ্ট্রেট উপস্থিত হইলেন, তখন সকলে হরিহরকে ফেলিয়া পলায়নতৎপর হইল; কিন্তু তখন আর পলায়নের সুবিধা নাই, চারিদিকে লোক ছুটিয়া একে একে সকলকে গ্রেপ্তার করিল। হরিহরের মুখের আবৃত বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইলে হরিহর দুই দিনের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, এক পুলিসে সংবাদ দিতে যাইয়া নদী গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জনের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলাম, বাধ্য হইয়া আবার আর এক পুলিসের হাতে পড়িলাম! যাহা ঈশ্বর করেন, তাই হইবে, এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেব পুলিসের বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হরিহর সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া পুলিসের বড়কর্ত্তা প্রভৃতি অনেককে গ্রেপ্তার করিলেন, এবং আপন নৌকা সেই রাত্রেই খুলিয়া দিয়া চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদের সাজি।

একটী কথা লিখিতে ভুল হইয়াছে, থানায় সুশীলার ভ্রাতাদিগের মধ্যে সকলেই গিয়াছিল, কেবল একজন বাড়ীতে ছিলেন, তিনি প্রায়ই বাড়ীতে থাকিতেন। মকর্দ্দমার ফল যাহা হইল, তাহাতে সেই ভ্রাতা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ করিয়া তিনি মকর্দ্দমা নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইলেন, তারপর ভয় প্রদর্শন করিয়া সাধ্যমত সাক্ষীদিগকে ফিরাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হইল না,—যখন তাহার পিতা এবং সহোদরেরা মেয়াদ খাটিতে চলিল, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, অসহায়া সুশীলার প্রতি তখন অত্যাচার আরম্ভ হইল। তিরস্কার,গঞ্জনা ও প্রহার পর্য্যন্ত যখন সুশীলাকে ব্যথিত করিতে পরাস্ত হইল; তখন উপযুক্ত ভ্রাতা ভগ্নীকে পাপ সলিলে নিমগ্ন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। সুশীলার মাতা হাতে তুলিয়া বিষপাত্র মুখের নিকট ধরিতে লাগিলেন, সুশীলা রূপের মায়ায় ভুলিয়া প্রলোভনকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনকে কলঙ্কিত করিতে

যখন অসম্মত হইলেন, তখন নিরপেক্ষ বিচারক সুশীলার সাধের জননী স্বামী ও পুত্রের অদর্শন জনিত কষ্ট রাশিকে সুশীলার শোণিতপাত করিয়া বিস্মৃত হইতে প্রস্তুত হইলেন। জননী যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? পৃথিবীতে সন্তানের একমাত্র নিরাপদ স্থান জননীর অঞ্চল,—সন্তানের একমাত্র সুখ ও শান্তির আলয় জননীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত, সেই জননী অঞ্চল ঝাড়িয়া যখন সুশীলার মমতা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন আর সুশীলার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? হতভাগিনীর স্বামী একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়ের স্থান ছিল, কিন্তু স্বামী কোথায়? হরিহর মকর্দ্দমার পর কোথায় গিয়াছেন, তাহা সুশীলা জানেন না। এক একবার হরিহরের মাতুলবাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু একাকিনী গেলে লোকে কি বলিবে, এই চিন্তা করিয়া নিবৃত্ত হইতে লাগিলেন। লজ্জা যদি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার অন্তরায় হয়, তবে সে লজ্জা কি পরিহার্য্য নহে? মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যদি লজ্জাকে পরিহার করিতে হয়, তাহাতে কি সঙ্কুচিত হওয়া উচিত? সুশীলা পাড়াগেয়ে মেয়ে, তিনি লজ্জাকেই জীবনের ভূষণ,—সতীত্বের উৎকৃষ্ট লক্ষণ মনে করেন; সুশীলা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তবুও লজ্জাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দুই তিন দিন এক ভাবেই গত হইল। সুশীলা কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। তিনি আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পৃথিবীর মায়া মমতা পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই প্রকার নানা চিন্তায় জড়সড় হইয়া সুশীলা মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন, রাত্রে চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে অন্ন নাই, সুশীলা জননীর বিষ প্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাতের অপেক্ষা করিতেছেন। সুশীলার মনের দুঃখ কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার যো নাই, এমন কি উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের যাতনা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন না। এই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ এক দিন দ্বিপ্রহর রজনীর সময় একখানি নৌকা আসিয়া সুশীলাদের ঘাটে সংলগ্ন হইল। সুশীলাদের খিড়কির পুকুরে বর্ষার সময় নৌকা আসিত। পুকুরটী নানা প্রকার বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত, বৃক্ষের ছায়া জলের উপর পড়িয়া পুকুরটীকে অন্ধকারে আবৃত করিয়া রাখিত। নৌকা কোথা হইতে আসিল, তাহা কেহই জানে না, সকলেই নিদ্রায় বিচেতন। নৌকা ঘাটে সংলগ্ন হইলে একজন লোক অগ্রে২ নৌকা হইতে

তীরে উঠিলেন, তাহার হস্তে একখানি তরবারি, পশ্চাতে আর একটী লোক উঠিলেন, তাহার হস্তে একটী মাত্র দোনালা বন্দুক। উভয়ে উপরে উঠিয়া যে ঘরে সুশীলা শয়ন করিয়াছিলেন সেই ঘরের দরজায় আঘাত করিয়া চুপে চুপে বলিলেন,— শীঘ্র আমাদের সহিত চলুন, আমরা হরিহর বাবুর লোক, আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

সুশীলা জাগরিত ছিলেন, সহসা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, ইষ্টদেবতাকে বারম্বার স্মরণ করিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ হইল না, হরিহর বাবুর নাম শুনিয়াই তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া সেই অপরিচিত লোকদিগের পশ্চাৎগামিনী হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন এই সময়ে জননী এবং ভ্রাতা নিদ্রাভিভূত আছেন, এই সময়ে না গেলে, আর যাওয়া হইবে না, বিশেষতঃ তিনি কয়েকদিন যাবত বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। সুশীলা মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই অপরিচিত লোকদিগের নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দেখিতে ২ লক্ষ্মীপাশা গ্রামকে অতিক্রম করিয়া চলিল। লক্ষ্মীপাশা গ্রামকে অতিক্রম করিয়া নৌকা যখন তীরের ন্যায় ছুটিল, তখন সুশীলার হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল; প্রথমতঃ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এ বড়ই সুখের কথা, দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন, আপন সতীত্ব রত্নকে রক্ষা করিতে পারিলেন, এটীও অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তৃতীয়তঃ তিনি মনে ভাবিয়া ভীত হইতেছিলেন যে, ভ্রাতা ও জননী যদি পলায়নের কথা জানিতে পারেন, তবে সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিবেন; কিন্তু যখন লক্ষ্মীপাশা গ্রামকে অতিক্রম করিয়া নৌকা চলিল, তখন সে আশঙ্কা দূর হইল, এবং তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। যখন সুশীলার মনে আর কোন দুঃশ্চিন্তা রহিল না, তখন তিনি ঐ অপরিচিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন? হরিহর বাবু কোথায় আছেন? আমাকে লইয়া কোথায় যাইবেন?

লোকেরা আর সঙ্কুচিত না হইয়া বলিল,—হরিহর বাবু কোথায় আছেন তাহা আমরা কিছুই জানি না; তোমার মাতার কথানুসারে আমরা তোমাকে লইয়া যাইতেছি।

সুশীলার মাথায় যেন বাজ পড়িল, আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন,—তবে আপনারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন কেন?

লোকেরা উত্তর করিল,—তোমার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য?

সুশীলা পুনঃ উত্তর করিলেন,—মাতার আদেশে যখন আমাকে লইয়া চলিয়াছেন, তখন দিবসে কেন গেলেন না?

লোকেরা পুনঃ বলিল,—সর্ব্বসাধারণের ভয়ে, এবং পুলিসের ভয়ে।

সুশীলা বলিলেন,—আপনাদের পুলিসের ভয় কি?

লোকেরা বলিল,—পূর্ব্বে ভয় ছিল না, আজ কাল অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে।

সুশীলা আবার বলিলেন, আমাকে লইয়া আপনারা কোথায় চলিয়াছেন?

লোকেরা বলিল,—তোমার মাতা তোমাকে ৬০০ টাকা লইয়া বিক্রয় করিয়াছেন, পরশ্ব তোমার বিবাহ হইবে।

চতুর্দ্দিক হইতে বিপদরাশি আসিয়া যেন সুশীলাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, তিনি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন,—আমার একবার বিবাহ হইয়াছে, আবার কোন্ শাস্ত্র মতে বিবাহ হইবে?

উত্তর হইল—তোমার বিবাহের কথা আমরা জানি, কিন্তু যে দেশে বিবাহ হইবে সে দেশের লোকেরা কেহই জানে না। পরশ্ব তোমার বিবাহ হইবে।

সুশীলা বলিলেন,—আমি যদি আত্মহত্যা করিয়া মরি।

উত্তর হইল,—আমরা থাকিতে তাহা পারিবে না।

সুশীলা।—তোমরা কে?

উত্তর হইল,—তোমার পিতার শিষ্য, উলাকান্দার ডাকাতদিগের সর্দ্দার।

এই কথা শুনিয়া সুশীলা সহসা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া নৌকায় দেহকে লুণ্ঠিত করিলেন। নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিয়া চলিল।

পরদিন লক্ষ্মীপাশায় ঘোষিত হইল সুশীলা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সুশীলার মৃত্যু সংবাদ লোকের মুখে মুখে গ্রামের ভিতরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিহর সংস্কারক।

মকর্দ্দমার পর, হরিহর মাতুলবাড়ী হইতে লোকজন লইয়া, সুশীলাকে আনয়ন করিবার জন্য লক্ষ্মীপাশা উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, সুশীলার মৃত্যু হইয়াছে। সুশীলার মৃত্যুতে হরিহর অত্যন্ত কাতর হইলেন। সুশীলার সৎস্বভাবে হরিহর মুগ্ধ ছিলেন। হরিহরের জীবনের একমাত্র ভালবাসার বস্তুকে হারাইয়া হরিহর উন্মত্তের ন্যায় হইয়া আবার মাতুলবাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে হরিহর সুশীলাকে ভুলিতে লাগিলেন। শোক চিরকাল কোন মনুষ্যকে মলিন করিয়া রাখে না, হরিহর সুশীলাকে ভুলিতে লাগিলেন। তিনি যে ৫টী বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার একজন কারাবাসে গিয়াছেন; সুশীলার যে দুর্দ্দশা হইল তাহা পাঠক দেখিয়াছেন; কাদম্বিনীও লক্ষ্মীপাশার মেয়ে, তিনি আর স্বামীর নামও করেন না, মধ্যে মধ্যে ভ্রূণ হত্যা করিয়া আপনার সতীত্ব জগতে প্রচার করেন, হরিহর ইহা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। শরৎকুমারী যে পথে অগ্রসর হইয়া বিষপাত্র চুম্বন করি-তেছেন, চতুর হরিহরের তাহাও জানিতে বাকী নাই। হরিহর কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানে সকলের জীবনভারের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন; দেশের প্রচলিত আইন যাহাই বলুক না কেন, নীতির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে জ্ঞানদা, কাদম্বিনী বা শরৎকুমারী, ইহাদের কাহারও জন্য আর হরিহর দায়ী নহেন। তবে হরিহর যদি ইহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে পারিতেন, তবে মহত্ত্বের সীমা থাকিত না। কিন্তু হরিহর বালক, কলঙ্কিনীদিগকে সৎপথে আনিবার শক্তি হরিহরের নাই। সুশীলার জন্য হরিহর জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শুনিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই সময়ে বসন্তকুমারীর প্রতি হরিহরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। হরিহর বসন্তকুমারীকে লইয়া পূজার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, বসন্তকুমারীকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া, তারপর অন্য পাত্রস্থ করিয়া জীবনের দায় হইতে মুক্ত হইবেন। হরিহর কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রনিবাস পরিত্যাগ করিলেন; আর না হইলে বসন্তকুমারীর

খরচ নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য স্কুলের পুস্তকাদির সহিত অল্প বয়সেই বিদায় লইলেন; দিবসে এক আফিসে কেরাণীগিরি করিতে ও রজনীতে একটী ছাত্রকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকার করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তদ্বারা কোন প্রকারে দিন চলিতে লাগিল। হরিহরের একটী বন্ধুর বন্ধু বসন্তকুমারীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

এই প্রকার অবস্থায় হরিহর কিয়দ্দিবস ক্ষেপণ করেন। ক্রমে ক্রমে কলিকাতার অনেক লোকের সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মে। ভরণপোষণ সম্বন্ধে যখন আর চিন্তা রহিল না, তখন তিনি কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া 'বহুবিবাহ-নিবারণী' নামে একটী সভা সংস্থাপন করিলেন। যে উদ্দেশ্য হৃদয়ের নিভৃত স্থানে রাখিয়া হরিহর সভা স্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ না হইলেও হরিহরের ভাগ্যে কিছু যশ মান ঘটিল; সংবাদ পত্রে হরিহর প্রশংসা পাইতে লাগিলেন, শিক্ষিতশ্রেণী হরিহরের গুণ ঘোষণা করিতে লাগিল; হরিহর মর্ত্ত্যলোক হইতে আপন মস্তক তুলিলেন। এই সময়ে হরিহরের জীবনে কতকগুলি দূষিত ভাব দেখা যাইতে লাগিল। হরিহর একটা কিছু হইয়াছেন, যখন এই বিশ্বাসে দৃঢ় হইলেন, তখন হরিহর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবকে কিছু ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন,—সকলের মতের প্রতিবাদ করেন, সকলের ব্যবহারকে নিন্দা করেন, সকলকে উপেক্ষা করেন, তিনি যেন একজন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। অন্যে ভাল বক্তৃতা করেন, একথা তাঁহার সহ্য হয় না, অন্যে উত্তমরূপ তর্ক করিতে জানেন, ইহা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, অন্যে বেশ লিখিতে পারে, তাহা প্রাণান্তেও মন খুলিয়া স্বীকার করিবেন না। তার্কিক বল, বক্তা বল, লেখক বল, হরিহরের ন্যায় আর দ্বিতীয় নাই। ক্রমে ক্রমে হরিহরের ব্যবহারে বন্ধু বান্ধব সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সভার কতকগুলি সভ্য দুরভিসন্ধি করিয়া সভার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; কেহ কেহ বা একেবারে সভার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিল। সভাটী কিয়দ্দিবস পরেই উঠিয়া গেল। হরিহর তাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হরিহর তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না; যে সকল ছাই ভস্ম লিখিয়া তিনি কাগজ পূর্ণ করিতেন, তাহা পয়সা খরচ করিয়া কে গ্রহণ করিবে? হরিহর বাবু বাঙ্গালী জাতিকে নেমকহারাম অকৃতজ্ঞ বলিয়া গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে গ্রাহকেরা আরো বিরক্ত হইয়া

উঠিল, কাগজের গ্রাহক একেবারে কমিয়া গেল, অবশেষে কাগজ খানি জলবিম্বের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। হরিহর বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বাঙ্গলা দেশের উপকার করিতে চেষ্টা করা গুলিখোরের কার্য্য বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন। একটী কারণে অনেকে আজ পর্য্যন্ত হরিহরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। বহুবিবাহ করা অন্যায় কার্য্য বলিয়া তিনি আপন স্ত্রীকে পর্য্যন্ত অন্যের সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই মহত্বের গুণে হরিহর বাবুকে আজও অনেকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিবাহাদি সম্বন্ধে হরিহরের অত্যন্ত উন্নত মত বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। ক্রমে ক্রমে হরিহর বাবু দুই চারি খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন। অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থকারের ন্যায় প্রথমে একখানি নাটক লিখিয়া, নাটক কোন্ প্রকার হওয়া উচিত তাহা জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মূর্খ জগৎ তাঁহার সার কথায় কর্ণপাত করিল না। তারপর তিনি একখানি কবিতা লিখিলেন, বাঙ্গলায় কবিতার অত্যন্ত আদর, পুস্তকখানিতে কিছু হৃদয়ের কথাও ছিল, কবিতা পুস্তকখানি বেশ বিক্রয় হইল। হরিহর বাবু বন্ধুবান্ধবদিগকে বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কি ছাই কবিতা লিখিতে পারে, কেবল শব্দ-বিন্যাসের ছড়াছড়ী করিয়া বাহাদুরি লয়। এবার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া হরিহর বাবু একখানি উপন্যাস আর এক খানি ইতিহাস লিখিলেন; উপন্যাস খানিতে আপনার জীবনের অনেক কথা ব্যক্ত করিলেন। এই পুস্তকে বিবাহ প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা লিখিলেন, সম্বন্ধ করিয়া যে বিবাহ হয়, তাহার শ্রাদ্ধ করিয়া উদার মতের বিবাহ প্রথাকে উত্তমরূপে পোষণ করিলেন;—পাত্র পাত্রীর মন মিলন হইবে, উভয়ে উভয়ের প্রেম-ভিখারী হইবে, তবেই বিবাহ হওয়া উচিত। পূর্ব্বে উভয়ের সহিত আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা হইলে যদি বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাতে ভীত হওয়া উচিত নহে, কারণ আশঙ্কা সত্বেও তাহাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা অধিক; এই প্রকারে অনেক কথা উপন্যাসে লিখিয়া প্রকাশ করিলেন, বলিতে কি, এই পুস্তক প্রকাশিত হইতে না হইতে চতুর্দ্দিক হইতে হরিহরের প্রশংসা বাহির হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে পুস্তকের পাঁচ সংস্করণ উঠিয়া গেল। হরিহর বাবুর মনোরথ পূর্ণ হইল, তিনি অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হরিহর বাবু অহঙ্কারের রাজ্যের প্রজা হইলেও ইহার হৃদয়ে একটু ধর্ম্মভাব ছিল।

যে বন্ধুটী বসন্তকুমারীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম

জ্ঞানচন্দ্র। জ্ঞানচন্দ্র একজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, বয়স ১৮ বৎসর হইবে, দেখিতে বলিষ্ঠ, সুশ্রী যুবা পুরুষ। হরিহর বাবু যখন ইহার প্রতি বসন্তকুমারীর শিক্ষা কার্য্যের ভারার্পণ করেন, তখন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, জ্ঞানচন্দ্রের ইচ্ছা হইলে বসন্তকুমারীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। বসন্তকুমারী এক্ষণ যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন, হরিহরের অভি-প্রায়ানুসারে জ্ঞানচন্দ্রকে হৃদয়ের প্রেম আসনে উপবেশন করাইতে প্রস্তুত হইলেন। যৌবনে স্ত্রীলোকের আধিপত্য কি প্রকারে বিস্তৃত হয়, জ্ঞানচন্দ্রের পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিছুই শিক্ষা ছিল না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের মধ্যে যেন শলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল; সতর্ক হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু পারেন না, হৃদয়ের বল ও সামর্থ্য যেন চলিয়া যাইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয়ের মধ্যে বসন্তকুমারীর ছবি প্রতিবিম্বিত হইল! পাখী ইচ্ছা করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে যত্ন করিল। তুমি আমি এ শাস্ত্রের কিছুই বুঝি না। আমাদের এ শাস্ত্র বুঝিবার শক্তি অতি অল্প। ঐশ্বর্য্যবান লোকের কন্যার সহিতই রাজকুমারের বিবাহ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু দরিদ্রের সহিত যদি রাজকুমার একত্রে কিছুদিন মিশিতেন, তবে তাহার বিবাহের কাহিনী যে রূপান্তরিত হইত না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। ভালবাসার সময় ধন জন ঐশ্বর্য্য ইহার কিছুই প্রেমিক-দিগের মনে স্থান পায় না, কোন প্রকার অবস্থা হৃদয়ের স্বাভাবিক গতিকে রোধ করিতে পারে না। দেশের প্রায় সকল সমাজের অভিভাবকগণ চেষ্টা করিয়া ভালবাসাকে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আবদ্ধ করিয়া থাকেন, নচেৎ একদিকে যেমন চণ্ডালেরও ব্রাহ্মণ তনয়ার সহিত বিবাহ হইত, অন্যদিকে রাজকুমারীর সহিত গোপাল কর্ম্মকারের বা অমুক জজ বা উকীলের কুমারীর সহিত বেণী-দোকানদারের পরিণয় কার্য্য সমাধা হইত। যাহা বলিতেছিলাম, জ্ঞানচন্দ্র ও বসন্তকুমারীর প্রণয়! উভয়ের মধ্যে যখন ভালবাসা গভীর ভাব ধারণ করিল, তখন হরিহর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, উদ্বিগ্ন হইলেন,—জ্ঞানচন্দ্রকে বিধি-মত তিরস্কার করিলেন, বসন্তকুমারীকে প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন। আর বিবাহ সম্বন্ধে হরিহরের উন্নত মত নাই, হরিহর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সঙ্কীর্ণমনাদিগের দলভুক্ত হইয়া বিধিমতে জ্ঞানচন্দ্রের অনিষ্ট চেষ্টায় রত হইলেন। জ্ঞানচন্দ্র বুদ্ধিবান যুবক, হরিহরের প্রতি বিরক্ত হইলেও বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিয়া স্থানান্তরিত হইলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বসন্তকুমারীর মন

ফিরাইতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্তকুমারী হরিহরের মুখের পানে না চাহিয়া আপনার পথ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্তকুমারীর ব্যবহারে উন্নত চেতা হরিহর অন্তরে বাহিরে জ্বলিয়া মরিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ছাত্র হরিহরের পরিণাম।

কিয়দ্দিবস মধ্যে হরিহরের ভিতরের অনেক সংবাদ বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতায় বাবুগিরি করিতে, সংবাদ পত্রাদি প্রকাশ করিতে এবং পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে যে সকল টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই হরিহর ঋণ করিয়া চালাইয়াছিলেন। পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা বিলাসের সেবায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, যন্ত্রালয়ের দেনা, কাগজওয়ালার দেনা সকলি বাকী রহিয়াছে। হরিহর বাবুর বাবুগিরির কথা না লিখিলেই ভাল হইত, যাহা হউক যখন আরম্ভ করা গিয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখাই ভাল। হরিহর বাবুর চরিত্রে কোন প্রকার দোষ নাই সত্য, কিন্তু অপরের টাকা ধার করিয়া অপব্যয় করাকে যদি দোষের মধ্যে গণ্য করা যায়, তবে হরিহর বাবু কোন মতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। হরিহর বাবু মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু আয় অপেক্ষা বিলাসের জন্য অধিক ব্যয় বাহুল্যকে যদি পাপ মধ্যে গণ্য করা যায়, তবে হরিহর বাবুকে বাদ দেওয়া যায় না। পুস্তকে যাহাই প্রকাশ করুন, মনুষ্যকে উপদেশ দিবার সময় যাহাই বলুন, হরিহর বাবু একজন প্রসিদ্ধ বিলাসী যুবা পুরুষ;—মাথায় ল্যাভাণ্ডার ওয়াটার, ইউডিকোলং, গোলাপ, পোমেটম ইত্যাদি না হইলে মস্তক শীতল হয় না; ভাল২ কোট, ভাল২ ধুতি, ভাল২ জুতা, ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র সকলি প্রথম শ্রেণীর চাই। কেরাণীগিরি ও ছাত্র পড়ানে যাহা আসিত তাহাতে সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ হইত না, ক্রমে ২ হরিহর বাবুর আয় অপেক্ষা খরচ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। প্রত্যহ বাবুর মাংস, পলান্ন না হইলে

উদরপূর্ত্তি হয় না, ঘৃত দুগ্ধ ভিন্ন কোন দ্রব্যই গলাধঃকরণ করা হয় না। এ সকল চাই, নচেৎ লোকে সংস্কারক, বড়লোক বলিবে কেন? নচেৎ লোকে মানিবে কেন? হরিহর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তর দিতেন। এই প্রকারে হরিহর বাবুর প্রায় চারি সহস্র টাকা ঋণ দাঁড়াইয়াছে। হরিহর বাবুর একটা মহৎ গুণ ছিল, তিনি বিপদে কাতর হইতেন না,—ঋণ হইয়াছে শোধ করিব, টাকার জন্য চিন্তা কি, পৃথিবীতে টাকা ছড়ান রহিয়াছে, কুড়াইয়া লইলেই হয়, এই কথা অন্যকে বলিয়া এবং নিজে ভাবিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। মধ্যে একবার পীড়া হয়, তাহাতেও কতক টাকা হাওলাত হয়। হরিহর বাবুর ভিতরের সকল কথা যখন জগতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন তিনি দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হরিহর বাবু সংস্কারক, এই কার্য্যেই তিনি বিশেষ পারদর্শী, প্রথমে কলিকাতার বড় লোকদিগকে ধরিয়া দেশে দেশে আন্দোলন করিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করা উচিত, এই কথা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; মনে মনে ভাবিলেন মাসিক ১৫০।২০০ টাকা তুলিতে পারিলে আপনিই আন্দোলন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিবেন। এ বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, কলিকাতার লোকেরা বিশেষ চতুর, সহজে ঘরের টাকা বাহির করিতে চায় না, তিনি কলিকাতার লোকদিগের নিকট পরাস্থ হইলেন। তৎপরে মফঃস্বলের ধনীদিগের নিকট বিষয়টী লইয়া কিয়দ্দিবস আন্দোলন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছুই হইল না, দেশের উপকারের জন্য টাকা দেওয়া এদেশীয়দিগের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই; হরিহরের স্বার্থময় চেষ্টা বিফল হইল, হরিহর দেশের লোকদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া গালাগালি করিয়া এদিক হইতেও নিরস্ত হইলেন। তারপর হরিহর বাবু একটী উপায় ধার্য্য করিলেন, প্রথমতঃ যে টাকাগুলি পরিশোধ না করিলে আর চলে না, সেই টাকাগুলি বসন্তকুমারীর বিবাহের পণ লইয়া পরিশোধ করিতে মনস্থ করিলেন। বসন্তকুমারী সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, বিবাহের জন্যই হউক বা যাহার জন্যই হউক, পণ দ্বারা ক্রয় করিতে কলিকাতার অনেক লোক অগ্রসর হইল, দুই সহস্র টাকা ধার্য্য হইল। জ্ঞানচন্দ্রের সহিত বসন্তকুমারীর সুখ দুঃখের বিনিময় হইয়া গিয়াছে; বসন্তকুমারী কি আর অন্যের বিলাসের সামগ্রী হইতে পারেন? জ্ঞানচন্দ্র কে? ইহার অবস্থা কি প্রকার?—তাহা বসন্তকুমারী বিশেষ জানিতেন না, বসন্তের মস্তিষ্ক

ঘুরিয়া গেল, আর উপায় দেখিতে পাইলেন না। মনে ভাবেন জ্ঞানচন্দ্র যদি দুই সহস্র টাকা যোগাড় করিতে পারে, তবেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়, কিন্তু জ্ঞানচন্দ্র কোথায় এত টাকা পাইবেন? তবে আর উপায় নাই, এই প্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া বসন্তকুমারী কাতর হইতে লাগিলেন। জ্ঞানচন্দ্রের নিকট বসন্ত প্রথমে এই টাকার কথা বলিলেন না, মনে ভাবিলেন এ কথা শুনিলে জ্ঞান-চন্দ্র উন্মত্ত হইবেন। তিনি জ্ঞানচন্দ্রকে লিখিতেন, যে প্রকারেই হউক 'বসন্ত' তোমারি হইবে। বসন্তকুমারী জ্ঞানচন্দ্রের নিকট এ সকল কথা ব্যক্ত না করিলেও, জ্ঞানচন্দ্র বাহিরে বাহিরে সকলি শুনিতে পাইলেন। টাকা দিলেই বসন্তকুমারীকে পাইবেন, একথা যখন জ্ঞানচন্দ্র শুনিলেন, তখন তাহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিলে জ্ঞানচন্দ্র দশ সহস্র টাকা দ্বারাও বসন্তকুমারীকে ক্রয় করিতে পারিতেন; বসন্ত এ কথা না জানিয়া কতই ভাবিতেছেন। জ্ঞানচন্দ্র বসন্তকুমারীর নিকট টাকার কথা বলিলেন না, মনে ভাবিলেন টাকা দিয়া ভালবাসা ক্রয় করিতেছি, একথা শুনিলে বসন্তকুমারীর মনে কষ্ট হইবে, আমাকে ধিক্কার দিবে। ভিতরে ২ জ্ঞানচন্দ্র টাকার কথা হরিহর বাবুকে বলিলেন, হরিহর বাবু অন্য স্থানে মাত্র দুই সহস্র টাকা পাইবেন আশা ছিল, জ্ঞানচন্দ্র একেবারে তিন সহস্র টাকা দিতে সম্মত হইলেন, হরিহরের সকল আপত্তি চলিয়া গেল, জ্ঞানচন্দ্রের সহিত বসন্তকুমারীর বিবাহ হইবে, ধার্য্য হইল। বসন্তকুমারী যখন এ কথা শুনিলেন, তখন তাহার মনের সকল মলিনতা দূর হইয়া গেল, মনে ভাবিতে লাগিলেন, জ্ঞানচন্দ্র কেমন করিয়া এত টাকার যোগাড় করিবেন। জ্ঞানচন্দ্রের আদেশে বাড়ী হইতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলে উপ-স্থিত হইলেন, তাহারা সবিশেষ কিছুই জানিতেন না, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশে জ্ঞানচন্দ্র বিবাহ করিতেছেন ভাবিয়া সকলেই উপস্থিত হইলেন; যথা সময়ে বসন্তকুমারীর সহিত জ্ঞানচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। জ্ঞানচন্দ্রের ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে, এই বৎসর তিনি পিতার ঐশ্বর্য্যে অধিকার পাই-লেন, বিবাহের পর আহ্লাদে ভাসিতে ভাসিতে প্রাণসম বসন্তকুমারীকে লইয়া আপন দেশে গমন করিলেন। জ্ঞানচন্দ্র যখন সিংহাসনে অধিরূঢ় হই-লেন, তখন তিনি গজেন্দ্রনারায়ণ নামে খ্যাত হইলেন, এবং বসন্তকুমারী প্রভাবতী নামে অভিহিত হইলেন। দেশে উভয়ে পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। হরিহর বাবু তিন সহস্র টাকা পাইয়া কিছু ঋণ পরিশোধ

করিলেন; অবশিষ্ট টাকা দ্বারা গাড়ী ঘোঁড়া ক্রয় করিলেন, কোট পেণ্টুলন ইত্যাদি সাহেবের সকল প্রকার আসবাব ক্রয় করিয়া চৌরঙ্গীতে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সাহেব হইয়া পড়িলেন। এই প্রকার করিবার অনেক গূঢ় কারণ ছিল। তিনি ক্রমে ইংরাজ বণিকদিগের হৌসে দালালী আরম্ভ করিলেন। হরিহরের বেশভূষা দেখিয়া বণিকদিগের অনেকেই মনে করিল, হরিহর বাবু সামান্য দরিদ্র নহেন,—বড় লোক। অনেকে ইহাকে মাল খরিদ করিতে অনুমতি দিতে লাগিল। হরিহর কিয়দ্দিবস নমুনানুসারে মাল দিয়া অনেক হৌসে প্রতিপত্তি ও সম্মান ক্রয় করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে জুয়াচুরি করিতে আরম্ভ করিলেন। হৌসের যে সকল বাবুরা মাল বুঝিয়া লইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঘুস দিয়া ক্রমে অল্প মূল্যের মাল চালাইতে লাগিলেন। এই প্রকারে হরিহর বাবুর বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। মধ্যে যাহারা হরিহর বাবুকে ঠাট্টা করিত, ঘৃণা করিত, উপহাস করিত, তাঁহারা হরিহরের ক্ষমতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইল, মনে মনে সকলে হরিহর বাবুকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। যাহারা ঋণের টাকার জন্য পীড়াপীড়ী আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত লজ্জিত হইল, এবং লজ্জার খাতিরে আবশ্যকমত আরো টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিল। হরিহর বাবুর দিন এই প্রকারে ভাল ভাবেই যাইতে লাগিল।

মেকি টাকা পৃথিবীতে কত দিন চলে? জাল জালিয়াত জুয়াচুরি করিয়া লোক কতদিন সংসারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে? পূর্ব্বে হরিহরের অন্তরে একটু ধর্ম্মভাব ছিল, কিন্তু সংসর্গের আধিপত্যে, অর্থের প্রলোভনে সে ভাব চলিয়া গিয়াছে, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি, এ সকল হরিহরের জীবনের ভূষণ হইয়াছে। স্কুলের ছাত্রের এই পরিণাম, ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়, লিখিতেও হস্ত কম্পিত হয়। ছাত্রদিগের জীবন কেন এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়? ছাত্রেরা যখন পুস্তকের নিকট বিদায় লইয়া সংসারকে আলিঙ্গন করিতে যায়, তখন কিয়দ্দিবস সংসারটাকে বড় ভয়ানক জিনিস বলিয়া বোধ হয়, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ব্যবহার, চরিত্রদোষ, স্বাধীনতা অপহরণের ইচ্ছা, এই সকল দেখিয়া দেখিয়া সংসারটাকে একটা ভয়ানক জিনিস বলিয়া বোধ হইতে থাকে। প্রথমে কোন মতেই মন ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে না; সংসার দ্বারে যাইয়া ছাত্র নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া পড়েন! চতুর্দ্দিকে পাপের চিত্র ছাত্রকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব দলে দলে জুটিয়া ছাত্রকে দলে মিশা-

ইতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকে। ছাত্রের একমাত্র সহায় পুস্তক কোথায়? বিজন অরণ্যে আশ্রয়হীন পথিক যেমন বাধ্য হইয়া ব্যাঘ্রের মুখের ভিতর প্রবিষ্ট হইতে থাকে, সংসার প্রবেশার্থী ছাত্র সেই প্রকার নিরাশ্রয় হইয়া পাপ ব্যাঘ্রের মুখের ভিতরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিতে থাকেন। এক দিন, দুদিন, দশ দিন, দেখিতে দেখিতে সাহস গেল, বল গেল, বিদ্যা গেল, বুদ্ধি গেল, ধর্ম্ম গেল, সকল পথিককে একে ২ পরিত্যাগ করিল, হতবুদ্ধি হইয়া বিপদের সময় অসহায় ছাত্র আত্ম সমর্পণ করিল। স্কুলে এমন কোন বলই ছাত্র পায় না, যাহাতে চিরকাল পাপের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাপের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, ছাত্র পরাজিত হইল, সংসার হাসির কলরব করিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে জয় জয়কার ধ্বনি উঠিল; প্রলোভন যুদ্ধে জয়ী হইয়া আবার শিকার অন্বেষণে বাহির হইল। এই প্রকারে প্রতিনিয়ত কত অসহায়, অবলম্বনহীন যুবক যে সংসর্গ এবং প্রলোভনের হস্তে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার গণনা হইতে পারে না। হতভাগ্য বাঙ্গলার ডাক্তার খানাই বল, উকীলের বৈঠকখানাই বল, কেরাণীর আড্ডাই বল, আর ব্যবসা-দারের আড়তই বল, এসকল মনে হইলে কেবল পাপের চিত্র আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। লোকে যাহাদিগকে দেশের গৌরব মনে করে,—লোকে যে সকল স্থানকে বাঞ্ছনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সে সকল লোকদিগকে, সে সকল স্থানকে নরকের কীট ও নরক বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হয়। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে না আছে বাঙ্গলায় চরিত্রের বল, না আছে ধর্ম্মের বল, না আছে হৃদয়ের বল, না আছে শরীরের বল!! এ সকলের অভাবে বাঙ্গলায় মনুষ্য বলিয়া কাহাকে ব্যাখ্যা করি! বাঙ্গলায় মনুষ্য নাই, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পশুর দল বিচরণ করিতেছে। আমরা পশু, আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলি এই শ্রেণী ভুক্ত; এই বাঙ্গলা সাত কোটী পশুর বাসস্থান হইয়া রহি-য়াছে। হরিহরকে দেখিয়া আমরা হাসিতেছি, আবার আমাদের হৃদয় দেখিয়া কতজনে হাসিতেছে; কাহার কথা কে বলিবে, কাহাকে কে নিন্দা করিবে, বাঙ্গলার ছোট বড় সকলি সমান! বাহিরে যাহাই বলি না কেন, আমরা সকলেই মেকলে সাহেবের জীবন্ত কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। হরিহরের জীবনে পরে কি ঘটিল? মেকি টাকা আর অধিক দিন চলিল না, হৌসের লোকেরা হরিহরের জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলিল। একবার যখন হরিহর ধরা পড়িলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে হরিহরের দোষ বাহির হইতে লাগিল;

চতুর্দ্দিক হইতে আদালতে, ফৌজদারীতে অভিযোগ উঠিল। দরিদ্র কুলীন হরিহর বাঙ্গলার ছাত্রের জীবনের পরিণাম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়া কারাবাসে চলিলেন। যাইবার সময় একটী বন্ধুকে অনুরোধ করিলেন,—বিধিমতে বসন্তকুমারীর অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিষাদের কাহিনী কে শুনিবে ?

কুলীনের ঘরের কাহিনী লিখিতে যাইয়া এবার আমরা অনেক পাপ চিত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম। অনেক পাঠক আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন, অনেকে কঠোর ভৎর্সনা বা গালাগালী করিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এ সকল বুঝিতে পারিয়াও আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, লেখনী সহজে সমস্ত ঘটনার উপর দিয়া চলিয়া আসিল, কোন স্থানে শঙ্কিত, সঙ্কুচিত বা স্তম্ভিত হইল না। এই যে এত পাপচিত্র অঙ্কিত হইল, ইহাতেই কি বাঙ্গলার কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহের সমস্ত ঘটনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে ?—না, তাহা হয় নাই। যাহারা নিরপেক্ষ চক্ষে কখনও বাঙ্গলার কুলীনের গৃহের বিভৎস ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করেন নাই, তাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিবেন,—আমরা সামান্য সামান্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছি, কিম্বা কল্পনাপ্রসূত অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ করিয়া পাঠকদিগের মনকে ক্লিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই প্রকার সত্যান্ধ হইয়া যিনি বাঙ্গলাকে সভ্যতা বা জ্ঞানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, তাহাকে আমরা নির্ভীক অন্তরে বলিব,—স্থূলদর্শী মানব, বাহিরের সভ্যতা দেখ আর না দেখ, যে শক্তির অভাবে বাঙ্গলার অন্তর শূন্যগর্ভ হইয়াছে,—তাহা একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখ ;—যদি বাঙ্গলার হিতৈষী হও, তবে সতীদাহ নিবারণ হইয়াছে বলিয়া কিম্বা বঙ্গোপসাগরে শিশু বিসর্জ্জন স্থগিত হইয়াছে বলিয়া সভায় নৃত্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা কিম্বা সংবাদপত্রে উন্নতির আশার স্বপ্নের কথা প্রকাশ

করিয়া উৎসাহের প্রবাহ এই সারশূন্য বঙ্গে ঢালিয়া দিও না; একবার স্থির চিত্তে কুলীনের বহু বিবাহের কুফল হৃদয়ঙ্গম কর, একবার অসহায়া বিধবাদিগের দুর্দ্দশার পানে তাকাও! হায়, যে দেশে কোটী২ অবলার শোকনিঃশ্বাস প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নির্গত হইয়া বায়ুকে উষ্ণ করিতেছে,—যে দেশে কোটী ২ অসহায়া রমণীর নয়নাশ্রুতে মৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে,—বলিতে কি,—যে দেশে কোটী ২ অবলার হৃদয়ের শক্তি অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, সে দেশে কি নৃত্য করিবার সময় আছে? ভ্রূণহত্যা মহাপাপে যে দেশ অবিরত নিমগ্ন,— সে দেশে আবার আনন্দ, উল্লাস ও শান্তি? বাঙ্গলার শক্তির পরীক্ষা কে করিবে? যে বলে বাঙ্গালীর শরীর দুর্ব্বল, সে কখনও বাঙ্গলার শক্তির পরীক্ষা করে নাই। বাঙ্গালীর শরীর দুর্ব্বল? না—কখনই নহে। আমরা বলি বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্ব্বল। মানবের শক্তি কোথায় নিহিত? শরীরে না মস্তিষ্কে? যে জাতির হৃদয় নাই, সে জাতির কোন শক্তি নাই। বাঙ্গালীর শরীর দুর্ব্বল? আমরা বলি বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্ব্বল, নচেৎ হৃদয় থাকিলে কি হাহাকার দেখিয়া কখনও নিরস্ত থাকা যায়; হৃদয় থাকিলে কি ঐ ভ্রূণহত্যার ব্যাপার দেখিয়া আহ্লাদে নৃত্য করা যায়,—ঐ অবলার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নীরবে থাকা যায়? শরীরের বলের কথা বল, উহা ত পাশব শক্তি, উহা কখনও পৃথিবীতে একতা সংস্থাপন করিতে পারে নাই। ঐ মস্তিষ্কের কথা বলিতে চাও? উহা ত কঠোরতা,—পৃথিবীকে মরুভূমি করিবার শক্তি; ঐ শক্তি পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত শান্তি আনয়ন করিতে পারে নাই। শক্তি কেবল হৃদয়ে,—অনাবিল স্বর্গীয় প্রেমে। হৃদয়বান মনুষ্যই এ জগতে শক্তিশ্রেষ্ঠ মনুষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাট্‌সিনি হৃদয়ের দ্বারা যে উপকার করিয়া গিয়াছেন,—যে শক্তির ক্রীড়া দেখাইয়া গিয়াছেন, নেপোলিয়ান পৃথিবীর সে উপকার করেন নাই, সে শক্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই। নেপোলিয়ান? তিনি ত পৃথিবীকে রক্তের স্রোতে ভাসাইয়া গিয়াছেন,—পৃথিবীকে শ্মশান করিয়া গিয়াছেন। আর এক শক্তির লীলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মিল দেখাইয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর উপকারের কথা বলিতে চাও?—মিল সুখের পৃথিবীকে মরুভূমি করিয়াছেন,— আজ হউক, কাল হউক, মিলের মত জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইলে, পৃথিবীতে কেবল অশান্তি আসিবে!! হৃদয়বান মনুষ্য সামান্য স্ত্রীর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, যে শক্তির স্ফুরণ করিতে পারে, কোন বীর, কোন জ্ঞানী আজ পর্য্যন্ত তাহা পারে নাই। আবার দেখ দেশহিতৈষী কে?

জ্ঞানের সাধক, না শরীরের শক্তিসাধক?—ইহার কেহই নহে। হিতৈষী সে, যাহার হৃদয় আছে,—যাহার প্রাণ অন্যের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া অস্থির হয়,—অন্যের বেদনায় যে কাতর হয়,—পৃথিবীর দুর্দ্দশায় যে মুহ্যমান হয়। হৃদয় না থাকিলে লোক হিতৈষী হইতে পারে না। বাঙ্গলায় কি হিতৈষী আছে? বাঙ্গলায় কি হৃদয়বান মনুষ্য আছে? যদি একজনও থাকিত, তবে ঐ ভ্রূণহত্যার স্রোত এতদিনে নিবারিত হইয়া যাইত। যদি একজনও থাকিত, তবে ঐ কুলীনের ঘর এত দিনে প্রকৃত শান্তির গৃহ হইত,—ঐ বিধবার হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপিত হইত। কেবল একজন? হা—কেবল একজন। একজনের হৃদয়ের শক্তিতে সমস্ত দেশ ত্রাণ পাইত, উদ্ধার হইয়া যাইত। বাঙ্গলায় যত হিতৈষী দেখা যায়, উহারা ভণ্ড,—বাঙ্গলায় যত লোক হৃদয়ের পূজায় প্রবৃত্ত, উহারা কেবল স্বার্থ খোঁজিয়া মরিতেছে, দেশকে দগ্ধ করিতেছে। হিতৈষী অনেক চাই না, হৃদয়বান লোক অনেক চাই না, একজনের আবির্ভাবে সমস্ত বাঙ্গলা রক্ষা পাইতে পারে। ম্যাট্‌সিনি, তুমি ইটালীতে না জন্মিয়া ভারত মহাশ্মশানে যদি জন্মিতে, তবে তোমার হৃদয়ের শক্তিতে এই সমস্ত শ্মশান শান্তির ভবন হইয়া যাইত। যে মানব দেশের জন্য, মানব জাতির উন্নতির জন্য অম্লান চিত্তে সমস্ত জীবন নির্ব্বাসনে এবং কারাবাসে অতিবাহিত করিতে পারে, প্রেমের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি তাহাকেই আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। আমরা প্রেম অনুসরণে যাইয়া স্বার্থের মায়ায় ভুলিয়া নিজের পরিণামও ডুবাইয়া দিতেছি, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্য দেশের পরিণামও ডুবাইয়া দিতেছি। বাঙ্গলায় হৃদয় নাই, শক্তি নাই, প্রেম নাই, একতা নাই,—নীতি নাই, পুণ্য নাই, এই বাঙ্গলার দুঃখ, এই বাঙ্গলার অভাব, নচেৎ শারীরিক বল বা মস্তিষ্কের বলের অভাবে এ দেশের কোন অপকার হইত না।

অসহায়া সুশীলা অচেতন হইয়া শূন্য নৌকায় ভাসিতেছেন, পাঠক, তোমার হৃদয় থাকিলে, নিশ্চয় তুমি সুশীলার কষ্ট দূর করিতে ধাবিত হইতে। সুশীলা বাঙ্গলার কোন্ পাপে আজ নিরাশ্রয় হইয়াছেন? কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ কি ইহার কারণ নহে? কাদম্বিনী ভ্রূণহত্যা করিতেছেন, জ্ঞানদা স্বামীর মস্তকে অস্ত্রাঘাত করিবার জন্য শাণিত অস্ত্রোত্তলন করিতেছেন, শরৎকুমারী অভিসার পথে হাটিয়া স্বীয় জীবনকে কলুষিত করিতেছেন কেন? কোন্ পাপে বাঙ্গলার এত দুর্দ্দশা? পাঠক, তোমরা দেখ আর না দেখ, কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহই ইহার মূল। পাঠক, তোমাদেরও হৃদয় নাই, আমাদেরও

নাই। তোমারা ঐ কাহিনী শুনিয়াই ভুলিয়া যাইতেছ, আমরা লিখিয়াই নিরস্ত হইতেছি। যদি ম্যাট্‌সিনির ন্যায় হৃদয় তোমরা কিম্বা আমরা পাইতাম, তবে আজ আমাদের শক্তির পরিচয়ে জগৎ মুগ্ধ হইত, দেশ কাঁপিয়া উঠিত। হৃদয় থাকিলে আমাদের লেখা তোমরা কল্পনার কথা বলিতে না, তোমাদের মুখে শুনিলে আমরা পুরাণ কথা মনে করিয়া নিবৃত্ত হইতাম না,—দেশে মহাশক্তির পূজা আরম্ভ করিতাম ;—হৃদয়ের বলে ঐ বিধবার আর্ত্তনাদ, ঐ সুশীলার দুঃখ শেষ করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতাম। বৃথা লেখনী ধরিয়াছি, কারণ আমাদের হৃদয় নাই ; আর যদি তোমাদের হৃদয় না থাকে, তবে তোমরা বৃথা বাঙ্গলার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিতে বসিয়াছ। লিখিলে কি হইবে ? যাহার হৃদয় নাই, সে হৃদয়ের সত্য কথাকেও কল্পনার কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবে। লিখিতে আর ইচ্ছা করে না। হৃদয়ের সহিত যদি একটী কথা লিখিতে পারিতাম, তবে শত সহস্র লোক বাঙ্গলার ঐ দুঃখ মোচন করিতে ধাবিত হইত। সে প্রকার হৃদয় নাই, তবে এ কাহিনী কেন লিখি ? বিধির বিড়ম্বনা !

সুশীলা যখন অচেতন হইয়া পড়িলেন তখন উলাকান্দার সর্দ্দারেরা ভীত হইয়া সুশীলাকে পরিত্যাগ করিল। তাহারা মনে ভাবিল সুশীলার মৃত্যু হইয়াছে। সুশীলা সেই নৌকায় অচেতন হইয়া রহিলেন। পরদিন কৃষকেরা সুশীলাকে মৃতাবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক লোক সেই স্থানে সমবেত হইল। একজন চিকিৎসক ঠিক করিলেন, সুশীলার শরীরের সমস্ত রক্ত মস্তিষ্কে উঠিয়াছে, আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, নাড়ী ক্ষীণ, হস্ত পদাদি শ্বেতবর্ণ। ভাবনায় চিন্তায় পূর্ব্বেই সুশীলার শরীর শীর্ণ হইয়াছিল, আকস্মিক ঘটনায় সেই শরীরের উপরে এক আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া সাধিত হইল। গ্রামের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক সুশী-লাকে ধরাধরী করিয়া উপরে তুলিয়া লইলেন ; তারপর মস্তকে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। জলসিঞ্চন করিতে করিতে সুশীলার একটু চেতনা হইলেই একজন চিকিৎসক আর কোন ঔষধ না পাইয়া অনেক খানি ব্রাণ্ডি সুশীলাকে পান করাইলেন; এবং পরে কতকখানি পারাঘটিত ঔষধ (ক্যালামেল) উদরস্থ করাইয়া দিলেন। এই দুই গ্রাম্য ঔষধে সুশীলা জীবন পাইলেন বটে, কিন্তু শরীরের স্বাস্থ্য একেবারে বিনষ্ট হইল। একটু সুস্থ হইতে না হইতে আবার দুশ্চিন্তা আসিয়া সুশীলাকে আক্রমণ করিল,—দিবানিশি কেবল হরিহর হরিহর ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার উন্মত্তের লক্ষণ দেখা যাইতে

লাগিল। প্রথমতঃ আহারের বিচার চলিয়া গেল, যাহা পাইতেন দুই হাতে তুলিয়া তাহাই খাইতেন; তারপর পরিধেয় বস্ত্রাদির বিচার চলিয়া যাইতে লাগিল, কখন কখন উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার বাজে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন;—ক্রমে ক্রমে অন্যের অনিষ্টচেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন,—বৃক্ষের পাতা, ফল ফুল দেখিলেই ছিড়িয়া কত গালাগালী করিতে থাকিতেন। এই প্রকারে সুশীলা উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পাগলের শুশ্রূষা কে করিতে পারে? নিতান্ত আত্মীয়জনের উন্মত্ত অবস্থায় পর্য্যন্ত শুশ্রূষা চলে না, এ ত ভূতের ব্যাগার খাটা, কোন সম্পর্ক নাই, কোন স্বার্থ নাই, তবুও দশদিন, পনর দিন, একমাস পর্য্যন্ত সেই ভদ্র লোকেরা সুশীলাকে শুশ্রূষা করিলেন, কিন্তু ক্রমে যখন সুশীলা আরো উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, তখন একখানি নৌকায় করিয়া একটী নদীর অপর পারে সুশীলাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিল। অনাথা এত দিনে সংসারের বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া কৌলিন্য প্রথার মঙ্গল ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাগলিনী।

আনন্দের বাজারে আনন্দের কেলি উঠিয়াছে। দাস দাসী, সর্দ্দার, নায়েব গোমস্তা, সকলেই উৎফুল্ল, সকলের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হইতে স্বাধীন চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দের বাজারে উৎফুল্ল চিত্তে কেলি করিতেছে। কেহ যৌবনের ভরে, কেহ প্রেমের ভরে, কেহ বা সুখের ভরে হাসিয়া খেলিয়া ফিরিতেছে। হায়, হায়, যে যৌবনের ভরে ফাটিয়া পড়িতেছে, সে একবার ও ভাবিতেছে না,—এ যৌবন এক দিন, দুদিনের তরে—আবার বার্দ্ধক্য আসিবে, আবার রূপ, তেজ সকলি প্রভাহীন হইবে! মনুষ্য কি অপরিণামদর্শী;—চিরকালের জন্য যাহাকে প্রেমে বাঁধিয়া রাখা যায় না, তাহাকে লইয়াই মত্ত;—চিরদিন যে সুখ সমভাবে হৃদয়কে তোষে না, সেই

সুখেই বিভোর। আর জমিদারের বাড়ী,—সংসারের সকল আসক্তির মূল অর্থ রাশির ভিতরে আবার বৈরাগ্য শিক্ষা !!—ধর্ম্মের কথা—অশান্তির কথা, সব ভুলিয়া যাও, আনন্দের বাজারে ফুল্ল মুখে খাও, দাও, নেও, হাস, খেল, বেড়াও। বাস্তবিকই আজ আনন্দের দিন ! এই দিনে ভদ্রেশ্বরের রাজা গজেন্দ্র-নারায়ণের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া এই দিনে রাজবাড়ীতে বৎসর বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। অনেক অর্থব্যয় করিয়া নর্ত্তক নর্ত্তকী, যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি রাজবাড়ীতে আনীত হইয়াছে, রাজবাড়ীর সকলে আজ বিশেষ আহ্লাদে উন্মত্ত। রাজা স্বয়ং লোক জনের আহার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেছেন। এই দিনে দীন দুঃখীকে অর্থ ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে; রাজা স্বয়ং সকল তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কেহ খাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, আজ রাজবাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ।

রাজবাড়ী আজ আনন্দে পরিপূর্ণ;—রাজার মন আজ সুখসাগরে ভাসিতেছে; কিন্তু রাজরাণী কোথায়? পাঠক, ক্ষণকাল চল রাণী এই বিশেষ দিনে কি করিতেছেন, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি। এ কি? এবেশও কি রাণীর সাজে? পোড়া কপাল আর কি, নচেৎ সোণার প্রতিমা এই সুখের দিনে কেন অঞ্চলে অঙ্গ লুটাইয়া মুখ ভার করিয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন! কেহই রাণীকে দেখিতেছে না, সকলেই ব্যস্ত। হায়, এ চিত্র কার প্রাণে সয়? পাষাণের দ্বারা যাহার অন্তর গঠিত, তাহার অন্তরও বিগলিত হইয়া যায়। পার্শ্বে একটী মাত্র পরিচারিকা উপবিষ্ট, রাণী মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত।

মধ্যাহ্ন সময়ে প্রায় প্রত্যহই একটী ভিখারিণী রাণীর নিকট ভিক্ষা মাগিতে আসিত। ভিখারিণী অল্প বয়স্কা—পাগলিনী। আজও পাগলিনী হেলিতে হেলিতে, দুলিতে দুলিতে, গান গাইতে গাইতে রাণীর গৃহের ভিতরে উপস্থিত। পাগলিনী অন্যমনস্ক, আপনার গানে আপনি মত্ত,—মস্তক দোলাইয়া গাইতে লাগিল;—

"গুরু যে ধন দিয়াছে তোরে, চিন্‌লি না তারে।"

গান শুনিয়া রাণী উঠিয়া বসিলেন, এমনি মিষ্ট স্বর যে, সে গানে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়; রাণী সানন্দচিত্তে বলিলেন,—পাগ্‌লি, আয়, তোর গানে আমার প্রাণ শীতল হয়, তোকে আজ ভাল করে খেতে দেব।

পাগ্‌লী পূর্ব্ব গান ছেড়ে আবার গাইল—

প্রেম-বাজারে প্রাণের সইলো, দেখ্‌বি যদি আয়,
কত নবীন বালা, ফুলের ডালা গড়াগড়ী যায়।

রাণী বলিলেন,—ছি, ও কি গান?—ভাল একটা গা।

ভিখারিণী হাসিতে হাসিতে বলিল, মা ঠাকুরুণ, আপনি আজ মাটিতে শুয়ে আছেন কেন? আজ আনন্দের দিন আপনার মনে কেন নিরানন্দ? আজ আমি এই গানই গাব। ভিখারিণী গাইল,—

রেখেছিনু কত সাধ করে, হৃদি মাঝে হৃদ্‌পিঞ্জরে সে প্রাণ-পাখীরে;
কোথায় উড়ে গেল, প্রাণ পলাল, তাহা বুঝা নাহি যায়।

রাণী আবার বলিলেন,—ছি, আগা নাই, গোড়া নাই, এ কি গান? ক্ষান্ত হ, বলিয়া পাগলিনীর মুখ টিপে ধরিলেন। পাগলিনী বলিল,—আপনি কেন মাটিতে শুয়ে আছেন, এ কথা যদি বলেন তবে আর এ গান গাব না।

রাণী বলিলেন, আচ্ছা, স্থির হ, তারপর বলি।

পাগলিনী স্থির হয়ে গালে হাত দিয়া বসিয়া বলিল,—বলুন।

রাণী বলিলেন, রাজবাড়ীতে আজ আনন্দের দিন, আমার এ দিনের কথা মনে হলেই প্রাণে আঘাত লাগে,—রাজা যদি কখনও আমার প্রতি বিরক্ত হন, তবে আমার কি দশা হবে!

ভিখারিণী হি হি করে হাসিয়া বলিল;—আপনারা কবে কি হবে, না হবে, তাই ভেবেই অস্থির, আর দেখুন ত আমি কেমন। এই বলে হি হি করে হাসিতে হাসিতে 'আচ্ছা আমি রাজাবাবুকে নিয়ে আস্‌ছি' এই বলে ভিখারিণী উঠে গেল।

রাণী বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু পাগলিনীর মন নিষেধ না মেনে ছুটিল। রাণী পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সদি, এ পাগ্‌লীর বিষয় তুই কিছু জানিস্? কোথা থেকে কেমন করে পাগ্‌লী এসেছে? এই সোনার প্রতিমা কি করে ঘরের বাহির হলো!

পরিচারিকা বলিল,—মা, তা কিছুই জানিনে, কিন্তু শুনেছি—পাগ্‌লীর স্বভাব চরিত্র খুব ভাল, আজও কলঙ্ক স্পর্শে নি।

রাণী বলিলেন, তুই যা, পাগ্‌লীকে কিছু দিয়ে আয়। আমি আজ পাগ্‌লীকে আশ্রয় দিয়ে রাখ্‌তে বল্‌ব। পাগ্‌লীর দুর্দ্দশা দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়। মনে মনে ভাবিলেন,—হা জগদীশ্বর, আমার দশা যদি পাগ্‌লীর মত হতো, তবে কি আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম! সকলি তোমার লীলা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দিনে দিনে।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী প্রভাবতী রাজার বড় ভালবাসার পদার্থ। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রণয় জন্মিয়াছে। রাজা প্রভাবতীকে এত ভালবাসিতেন যে, প্রায় কখনও প্রভাবতীর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রভাবতী বড় অনাথা, একটী কনিষ্ঠ সহোদর ভিন্ন আর পিতৃকুলে কেহই নাই। রাজাই প্রভার সকল, সুতরাং প্রভার হৃদয় মন সর্ব্বাং রাজার প্রেমসাগরে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। প্রভা আর কিছুই জানে না, রাজার মুখে হাসি দেখিলে প্রভার মুখে হাসি খেলে, রাজার মুখে কষ্টের চিহ্ন দেখিলে প্রভার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রভা অত্যন্ত শান্ত, বিনম্র, মিষ্টভাষিনী। প্রভার শরীর ও মনের উৎকৃষ্ট ভূষণ বিনয়, অহঙ্কারের লেশ মাত্র প্রভার শরীর ও মনের ত্রিসীমায় নাই। প্রভার পিতৃকুলে কেহ নাই সত্য, কিন্তু প্রভার কি অহঙ্কার করিবার কিছু ছিল না? বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর যাহার চরণে আবদ্ধ, তাঁহার আবার অহঙ্কার করিবার নাই কি? দাস দাসী, টাকা কড়ি, জিনিস পত্র, প্রভার নাই কি? কিন্তু তবুও প্রভা শান্ত, তবুও প্রভা বিনয়ী। যাহারা টাকা কড়ি, ধন ঐশ্বর্য্য, দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কত কি সুখস্বপ্ন দেখিয়া অহঙ্কারে পৃথিবীকে ধূলি কণার ন্যায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারা বলিবেন, প্রভা নির্ব্বোধ, প্রভা মূর্খ। প্রভার একমাত্র আসক্তির বস্তু পৃথিবীতে ঐ রাজা। বাস্তবিক উভয়ের প্রগাঢ় ভালবাসা দেখিলে প্রাণে বড়ই সুখ বোধ হয়।

রাজা বিষয় কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া প্রভাবতীকে দেখিয়া যাইতেন। রাজার কাছারীতে অবস্থিতিকালীন প্রভা কখন কখন আপন গৃহের জানালা খুলিয়া পথের পানে রাজার প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকিতেন। প্রভাবতী গৃহের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজে করিয়া থাকেন। অনেক বড় লোকের বাটীতে দেখা যায়, মেয়েরা ভ্রমেও সংসারের কার্য্যাদি দেখেন না, দাস দাসীরা সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। কে খাইল,

কে না খাইল, এ সকল কোন বিষয়ের সংবাদ তাহারা রাখেন না। তাহারা কেবল যেন সংসারের বিলাসের সামগ্রী হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের জীবনের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। প্রভাবতী সে ধরণের মেয়ে নহেন। দুঃখীর মেয়ে, সৌভাগ্যবশতঃ আজ রাজমহিষী হইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বের কথা প্রভা কিছুই ভুলিয়া যান নাই। তিনি স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন; এবং রাজার সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তে করেন,—রাজার কোন কার্য্য অন্য কেহ করিবে, ইহা তাহার প্রাণে-সয় না। কাপড় ধৌত করা হইতে জুতা পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত এ সকলই প্রভার কার্য্য। রাজা এজন্য মধ্যে মধ্যে প্রভাকে কত তিরস্কার করিতেন,—বলিতেন, আমার কি টাকা কড়ির কিছু অপ্রতুল আছে যে, তার জন্য তুমি খেটে খেটে সারা হতেছ। প্রভা এ কথার উত্তরে হাসিয়া বলিতেন, তোমার টাকা আছে, তদ্দ্বারা তুমি সৎকর্ম্ম কর, আমার জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য আমি করি। প্রভার স্বভাবের গুণে দাস দাসী হইতে গ্রামের ভদ্রমণ্ডলী, সকলেই সন্তুষ্ট।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে দিনের কথা বলা হইয়াছে, ঐ দিন ভিন্ন প্রভাবতীর মুখে বিবাহের পর আর কখনও নিরানন্দ দেখা যায় নাই। কেবল বৎসরের মধ্যে একদিন প্রভা প্রভাহীন হইয়া থাকেন। এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত বাড়ীর দুই একটী দাস দাসী ভিন্ন আর কেহই জানে না। উৎসবের দিন বাড়ীর আর আর সকলে এত ব্যস্ত থাকে যে, কেহই এপর্য্যন্ত প্রভার নিরানন্দের কারণ জানিতে পারে নাই। আজ পাগ্‌লী যাইয়া তাহার রাজাবাবুকে বলিল,—একবার বাড়ীর ভিতরে যান, রাণী আজ রাগ করে রয়েছেন।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ পাগ্‌লীর কথা অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, তাহার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দেখিলেন, সত্যই রাণী ধূলি-শয্যায়। রাজাকে দেখিয়াই প্রভাবতী উঠিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। রাজা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভা আজ তোমার এভাব কেন? আমার কোন ব্যবহারে তুমি বিরক্ত হয়েছ?

প্রভাবতী পাড়াগেঁয়ে বউঝির ন্যায় আর মুখ ফুলাইয়া থাকিতে পারিলেন না,—ঘোম্‌টা টানিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তোমার ব্যবহারে আমি বিরক্ত হব? তুমি যে আমার জীবন, তাকি তুমি জান না?

রাজা পুনঃ বলিলেন, তবে আজ উৎসবের দিন তোমার এভাব কেন? তুমি যদি বল তবে এখনি সকল স্থগিত রাখি।

প্রভাবতী বলিলেন, তোমাকে বলিব কি, এই উৎসবের দিন আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়,—আশঙ্কা হয় এই সুখের দিন যদি সময়ে আমার দুঃখের দিন হয়, তবে তখন আর প্রাণ রাখিতে পারিব না; এই প্রকার কত কি ছাই ভস্ম ভাবিয়া অস্থির হই, উৎসবে যোগ দিই না।

রাজা বলিলেন,আমার প্রতি কি তোমার কোন প্রকার সন্দেহ হয়?

এই কথা শুনিয়া প্রভাবতীর নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইল,কাতরস্বরে বলিলেন, তোমাকে যে দিন অবিশ্বাস করিব, সেই দিন প্রাণ যেন দেহ ছেড়ে যায়। এই বলিতে বলিতে প্রভাবতীর কণ্ঠরোধ হইল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; রাজা দেখিলেন প্রভাবতীর মনে এমন দারুণ আঘাত লাগিয়াছে যে, আর প্রভা ঠিক হয়ে থাকিতে পারিতেছেন না।

রাজা বলিলেন,—আমি জানি তুমি কখনও আমাকে সন্দেহ করিতে পার না, ঐ প্রকার কথা বলে আমি অপরাধী হয়েছি। প্রভা, আজ আনন্দের দিন,আর নিরানন্দে থেক না,যদি আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই দিন হতে আর তোমার মনে কষ্ট দিব না। চিরদিন তোমারই থাকিব।

প্রভাবতী মনের কষ্ট ভুলিয়া সস্নেহে রাজাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন—পাগ্‌লীর কোন উপায় না করিলে আর আমার মন সুস্থ হয় না; তুমি পাগ্‌লীর জন্য একটা কিছু সদুপায় কর।

রাজা বলিলেন, তুমি এক্ষণ আনন্দের উৎসবে যোগ দেও, আমি সত্বরই পাগ্‌লীর জন্য কিছু করিতেছি। এই বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতীও রাজার অনুরোধে উৎসবে যোগ দিতে চলিলেন।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ আজ অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু কি কারণে যেন তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এতকাল প্রভাবতীর গুণে এত বশীভূত ছিলেন যে, অন্য রমণীর প্রতি দৃক্‌পাত করিতেও তাহার কষ্ট হইত। পাগ্‌লীকে তিনি কত বার দেখিয়াছেন,কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যরাশি রাজার নিকট এতদিন নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইত। আজ হইতে অন্তরের মধ্যে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যাহা হউক তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক, প্রভাই তাহার একমাত্র বন্ধু, সময়ান্তরে মনের কথা প্রভার

নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রভাবতী রাজার হৃদয় হইতে কণ্টক তুলিয়া ফেলিতে অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন; রাজার মন দিন দিন এত বিষণ্ণ হইতে লাগিল যে, প্রভার অন্তরে যেন দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। প্রভাবতীর যত্ন আরো বৃদ্ধি হইল, ভালবাসার ভাব কত মধুময় হইল, কিন্তু রাজার নিকটে সকলি যেন কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। রাজা স্বয়ং আপনার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, তিনিও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টায় তৎপর হইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। সংসারের রূপ, সংসারের সৌন্দর্য্য এতদিন রাজার নিকট আঁধার বলিয়া বোধ হইত। এখন সংসার যেন নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া রাজার নয়ন মনকে ভুলাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বোধ প্রভার সরলতা।

সংসারের রূপে যাহার মন ভোলে, তাহার আর নিস্তার নাই। পৃথিবীর অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাহ্য সংসারের মধ্যে প্রলোভনের আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু যাহারা সূক্ষ্মদর্শী তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, এই পৃথিবীই প্রলোভনের একমাত্র স্থান নহে;—মানবের মনের ভিতরেই প্রলোভন গুপ্তভাবে পোষিত হইয়া মানবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। যাহারা আত্মজয়ী, তাহারা সংসারের কোন আকর্ষণেই ভুলিয়া আপন পথ পরিত্যাগ করে না; সংসারের যে সকল বস্তুকে প্রলোভন বলা যায়, তাহা আর তাহাদের নিকট প্রলোভন বলিয়া বোধ হয় না। মানবের অন্তর পরিশুদ্ধ হইলে পৃথিবী পরিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই জন্যই আমরা বলি প্রলোভনের কেন্দ্র মানবের অন্তরের মধ্যে নিহিত। তবে এ কথা ঠিক যে, বাহিরের আকর্ষণের বস্তু না দেখিলে মন কখনও বিচলিত হয় না। কিন্তু প্রলোভনের চিরপ্রতিষ্ঠিত আসন মানব অন্তরে। যদি তাই না হবে,

তবে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ কেন এতদিন ভুলেন নাই? বাহিরের রূপ, শোভা সৌন্দর্য্য, এ সকল কি এতদিন রাজার চক্ষে পড়ে নাই? তবে কেন রাজা এতদিন পৃথিবীর সকল সুখ প্রভাবতীতে নিহিত দেখিতেন? প্রভাবতী ভিন্ন কি আর সুখের বস্তু ছিল না? কেবল রাজা গজেন্দ্র নারায়ণের জন্যই কি পৃথিবীর সকল সুখ এক মাত্র প্রভাবতীর মধ্যে কেন্দ্রী-ভূত হইয়াছিল? পৃথিবীতে আরো সুখের বস্তু ছিল, কিন্তু রাজার তাহাতে আসক্তি ছিল না, তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল না। সংসারে প্রলোভনের বস্তু থাকিতেও এত দিন সে সকল রাজার মনোরাজ্যে কোন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তবে প্রলোভন মানবের অন্তরে নিহিত না ত আর কোথায়?

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ একদিন প্রভাবতীর অনুরোধে সেই পাগলিনীকে ডাকাইয়া আনিলেন। কিন্তু পাগলিনীর আর পূর্ব্বের রূপ নাই, রাজচক্ষে পাগলিনী আজ কত শোভার ভাণ্ডার। রাজা পাগলিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, কিন্তু অতি কষ্টে তাহা গোপন করিলেন। আমরা এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। পৃথিবীতে অনেক সতী আছেন, যাহারা স্বামীকে সৎ-পথে রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই ভীষণাকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। আমরা জানি, কুপথে পদার্পণ করিয়া অনেক স্বামী প্রেমপুত্তলি স্ত্রীর হস্তে কোন কোন স্থলে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া থাকেন। প্রভাবতী কখনও এ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিতেন না; তিনি ভাবিতেন, স্বামীকে বলপূর্ব্বক আমার প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা ;—দেবতা যেদিন বিমুখ হইবেন, মানব সে দিন শত চেষ্টায়ও কিছু করিতে পারিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল স্বামী যখন কুপথে যাইবেন, তখন কোন প্রকারেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিবেন না। প্রভাবতীর কোমল হৃদয় বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে যাইতে চায় না। স্বামীর মনের মধ্যে যখন একটু একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তখন প্রভা অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন, কিন্তু কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সরলা প্রভার মুখ আর ফোটে না; স্বামীর সহিত আর মন খুলিয়া তেমন মিষ্ট কথা বলিতে পারেন না। কথা বলিবার সময় চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে, কথা বলিতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে রাজা প্রভাবতীর এ সকল কোমল ভাবের মধুরতা বুঝিতে অক্ষম হইতে লাগি-লেন। তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন কি এক নূতন ভাব রাজ্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

পাগ্‌লী এ সকল কিছুই জানে না। সে অন্যদিনের ন্যায় রোজ আসে, হাসে, গায়, আবার চলিয়া যায়। রাজা পূর্ব্বে যে প্রকার অনিমেষ নয়নে প্রভাবতীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিতেন, আজ কাল পাগলিনীর পানে সেই প্রকার তাকাইয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে পাগলিনীকে নিকটে ডাকাইয়া আনেন। সে আসিয়া কত কি বকিতে থাকে, তাহাই রাজার কর্ণে অমৃত-বর্ষণ করে। প্রভাবতীর অঞ্চলের নিধির মন ক্রমে ক্রমে এই প্রকার বিষাক্ত হইয়া উঠিল। প্রভা স্বামীর সুখকেই জীবনের একমাত্র সুখ মনে করেন, তিনি স্বামীর সুখের পথে একটুও বাধা দিলেন না।

রাজা আজও বালকের ন্যায় সরল; তাহার মনের ভাব প্রভাবতীকে না বলিয়া থাকিতে পারেন না। প্রভাবতী যখন রাজার মনের কথা শুনিতে থাকেন, তখন তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে থাকে; মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। দিনান্তে স্বামীকে যদি একবার দেখিতে পাই, তবেই সকল বাসনা পূর্ণ হইবে, আজ কাল রাজার ভাবান্তর দেখিয়া প্রভা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন। আবার ভাবেন তাও যদি না হয়, তবে স্বামীর সুখের সংবাদ পাইলেই কৃতার্থ হইব। অবোধ প্রভার মন কি প্রকার কোমল ভাবে গঠিত!

কুশিক্ষাই হউক আর সুশিক্ষাই হউক, তদানীন্তন স্বামীপ্রাণা সতীগণ স্বামীর সুখকেই জীবনের একমাত্র সুখ মনে করিতেন। প্রভাবতী পৃথিবীর সকল কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু স্বামীর মনোবেদনা সহ্য করিতে পারেন না। স্বামীর মনের ভাব যখন তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলেন, তখন আপনিই ঘটকের কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। পাগ্‌লীকে ডাকিয়া তাহার মনের কথা শুনিতে লাগিলেন। সে দুই তিন দিন হাসিয়া হাসিয়া, নানারূপ বাজে কথা বলিয়াই প্রস্থান করিল; রাজমহিষী পাগ্‌লীর মনের কথা প্রকৃত পক্ষে কিছুই জানিতে পারিলেন না। ৭।৮ দিন বলিতে বলিতে পাগ্‌লীর মুখ একটু গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল,—লজ্জাশরম একটু একটু অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত হইতে লাগিল; একটু একটু সুস্থতার লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। পাগ্‌লী ১০।১২ দিন পরে রাজার সহিত মন খুলিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

এই প্রকারে প্রভাবতী পাগ্‌লীর পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন, এবং আপন হৃদয়ের রত্নকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরহস্তে অর্পণ করিবার আয়োজন করিলেন।

রমণী হৃদয়ের মহত্বই হউক আর যাহাই হউক, প্রভাবতী হাতে তুলিয়া হলাহল পান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যের অসাধ্য কি?

হাটে ঢোল বাজিয়া উঠিল। যে মেঘ এতদিন অতি গোপনে ভিতরে ভিতরে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা বর্ষাগমনে গগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যাহারা রাজাকে কুপথে আকৃষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল, আর যাহারা রাজার হিতাকাঙ্খী,তাহাদের অন্তর যেন উষ্ণশলাকার দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। মেঘসঞ্চারে আনন্দ এবং নিরানন্দ উভয়ই বিদ্যুতের ন্যায় কর্ম্মচারী এবং প্রতিবেশীগণের মুখে মুখে বিচরণ করিতে লাগিল।

যে কাহিনী শুনিতে প্রাণে আঘাত লাগে, সে কাহিনী আস্তে আস্তে লিখিয়া লাভ কি? প্রভাবতীর হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে নিশ্চয়, তবে আর বিলম্ব কেন? হায় হায়, মনুষ্যের হৃদয় কি প্রকার কলুষিতভাবে সময় সময় উত্তেজিত হইয়া থাকে। এই ঘটনা যখন সকলে জানিতে পারিল, তখন কতিপয় লোক চক্রান্ত করিয়া এক রাত্রে গোপনে পাগ্‌লীকে স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিল। পরদিন গজেন্দ্রনারায়ণ যখন শুনিলেন যে, পাগ্‌লী গ্রামে নাই, কোথায় পালায়ন করিয়াছে, তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে রাজাদেশে চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরিত হইল। সময়ে একে একে তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পাগলিনীকে পাওয়া গেল না। রাজা পাগলিনীর জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন।

যাহারা চক্রান্ত করিয়া পাগলিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা রাজাকে বলিতে লাগিল, মহারাজ, আপনার মহিষী হিংসা পরতন্ত্র হইয়া পাগলিনীকে দূর করিয়া দিয়াছেন।' একথা রাজার কাণে বাজিল। প্রভাবতী চক্রান্ত করিয়া পাগলিনীকে তাড়াইয়া দিয়াছে, এ কথাও কি সত্য

হইতে পারে ? রাজা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, যে প্রভা এই সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেছে, সে কেন এপ্রকার করিবে ? রাজা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন দেখিয়া প্রভাবতী আরো মনোক্ষুন্ন হইলেন। একি বিড়ম্বনা; যে অবলা স্বামীর সুখের জন্য আপন জীবন ও জীবনের সুখ পর্য্যন্ত অম্লান বদনে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাঁহার প্রাণে কি স্বামীর মনোকষ্ট সয় ? অবলা প্রভা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। পাগলিনীকে যদি না পাওয়া যায়, সে ত প্রভাবতীর পক্ষেই মঙ্গলের বিষয়; কিন্তু প্রভা সে মঙ্গল চায় না। লোকে বলিয়া থাকে মৃত্যু যখন সন্নিকট হয়, তখন রোগী কোন মতেই ঔষধ খাইয়া বাঁচিতে চায় না। প্রভারও তাই হইয়াছে। প্রভা আর অন্য সুখকে জীবনে স্থান দিতেছেন না, কেবল স্বামীর সুখের জন্যই ব্যস্ত হইয়াছেন। স্বামীও এত উতলা হইয়া উঠিলেন যে, সংসারের কাজ কর্ম্মের প্রতি আর তাহার মন যায় না, আর কিছুই ভাল লাগে না।

এক দিকে সরলা প্রভাবতীর মন এই প্রকার ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অন্য দিকে ক্রমে ক্রমে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের মন ক্রমেই সন্দেহজালে জড়িত হইতে লাগিল। ৪।৫ দিনের মধ্যেই রাজার মন সম্পূর্ণরূপে প্রভাবতীর বিরুদ্ধে ঝুঁকিয়া পড়িল; প্রভাবতী রাজার চক্ষের বিষ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ইহা করিয়াই চক্রান্তকারীরা ক্ষান্ত হইল না; রাজা প্রভাবতীকে যখন সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহারা গোপনে রাজাকে বলিল,—মহারাজ, বোধ করি আপনি জ্ঞাত আছেন যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার মহিষী পাগলিনীর সহিত যাহাতে আপনার প্রণয় জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন; ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছেন কি? বলিতে লজ্জাও করে, আশঙ্কাও করে, কিন্তু সত্য কথা না বলিলেও চলে না। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে সকলি বলিতে পারি।

রাজা বলিলেন,—কোন ভয়ের কারণ নাই, তোমরা বল।

চক্রান্তকারীর মধ্যে একজন গম্ভীর ভাবে মস্তক নত করিয়া বলিল;—রাজমহিষী ভ্রষ্টা হইয়াছেন, আপনি যদি অন্যের প্রতি অনুরক্ত হন, তবে তাহার বাসনা পূর্ণ হবে, ইহা মনে মনে কল্পনা করিয়াই মহিষী ঐ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রাজা বলিলেন,—যদি তাই হবে, তবে আবার তিনি কেন পাগলিনীকে দূর করিয়া দিলেন ?

চক্রান্তকারীগণের উত্তর করিতে বিলম্ব হইল না, একজন বলিল, মহারাজ, মহিষী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন,পাগলিনীর সহিত আপনার প্রণয় সঞ্চারিত হইলে তাহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবার পথ পরিষ্কার হইবে, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহা হইবার আশা নাই; কারণ আপনি তখন সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ কটাক্ষে মহিষীকে দেখিবেন; তখন সামান্য কারণেই আপনার মন সন্দেহপূর্ণ হইবে। এই সকল ভাবিয়া তিনি অবশেষে পাগ্‌লীকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

গজেন্দ্রনারায়ণ সকলি বুঝিতে পারিলেন। মহিষীর প্রতি তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীকে বলিলেন, রে পাপীয়সি, তোর সকল দুরভিসন্ধিই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি এতকাল দুগ্ধ দ্বারা যে গৃহে কালসর্প পুষেছিলাম, তাহা এতদিন পরে উত্তমরূপে বুঝ্‌তে পেরেছি।

রাজার এতাদৃশ কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সরলা প্রভাবতী অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন, রাজা কেন এ প্রকার বলিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাজার মুখে ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া তিনি নীরবে রহিলেন, নয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল; মনে মনে বলিলেন,—হা পরমেশ্বর, রাজগৃহেও তুমি কাঙ্গালিনীর জন্য এত কষ্ট সঞ্চয় করে রেখেছিলে!

সেই দিন বৈকালেই চক্রান্তকারীর একজন বলিল,—যদি রাজ্ঞীকে আপনি পরিত্যাগ করেন, তবে পাগ্‌লীকে আমরা আনিয়া দি; রাজ্ঞী রাজভবনে থাকিতে পাগ্‌লী আপনার বাড়ীতে আস্‌তে অত্যন্ত ভয় পায়। আপনি যদ্যপি পাগ্‌লীকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন, আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দুই দিবসের মধ্যে পাগ্‌লীকে রাজভবনে উপস্থিত করিব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা—আপনি অবিলম্বে আপনার ভ্রষ্টা মহিষীকে পরিত্যাগ করিবেন, রাজভবন হইতে অন্যূন দুপ্রহরের দূরস্থানে তাহাকে রাখিবেন।

২য়। আপনার ধন ঐশ্বর্য্য সকলি ঐ ভিখারিণী ও তাঁহার সন্তান সন্ততিকে দিবেন।

৩য়। কখনও ইহাকে বর্জ্জন করিতে পারিবেন না।

৪র্থ। ইহার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

রাজা এ সকল প্রতিজ্ঞাতেই সম্মত হইলেন। রাজমহিষীকে দুই দিবসের মধ্যেই পরিত্যাগ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই প্রকারে প্রভাবতীর

সকল সুখের দিক আঁধার হইয়া আসিতে লাগিল। রাজা প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যোগী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জীবন-মৃত্যুর রাজ্যে!

রাজসাহী জেলার অধীন ভদ্রেশ্বর নামক স্থানে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের বসতি। ভদ্রেশ্বর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজভবন ভিন্ন ভদ্রেশ্বরে শোভার বস্তু আর কিছুই নাই। মাত্র প্রকৃতি ভদ্রেশ্বরের নির্জ্জন জঙ্গলে আপনার শোভায় আপনি বিভূষিত হইয়া আছে। কেহ সে শোভা কখনও দর্শন করে না, কেহ কখনও সে সৌন্দর্য্যের মধুরতা অনুভব করে না। বাঙ্গলার সম্পত্তি কি? অনেকে বলেন, বাঙ্গলা শস্যশালিনী বলিয়া এত আদৃত। আমরা বলি বাঙ্গলার মনোহর সম্পত্তি বিহঙ্গকুল। নগর, উপনগর পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবার বাঙ্গলার পল্লীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি যদি বধির না হন, তবে বাঙ্গলার বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতে নিশ্চয় মোহিত হইয়াছেন। রাত্রি দিন, নির্জ্জন জঙ্গলে ঐ কলকণ্ঠ কত মধুই ঢালিয়া দিতেছে! মনুষ্য শুনুক বা না শুনুক, নির্জ্জনে কত বিহঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া আপন স্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া আপনারা মোহিত হইতেছে। বাঙ্গলার কোকিলের স্বর শ্রবণে কাহার প্রাণ না নবরসে আপ্লুত হয়! পাপীয়ার ঝঙ্কারে কাহার হৃদয় না নৃত্য করে? ঘুঘুর উদাস সঙ্গীত শ্রবণে কাহার হৃদয় না উদাস হয়? কত নাম করিব? সামান্য চড়াই বাবুই হইতে অতি সুমধুর কোকিল পর্য্যন্ত নানা প্রকার পাখী মিলিত হইয়া প্রাতে যখন বাঙ্গলার জঙ্গলকে সঙ্গীত ধ্বনিতে পূর্ণ করে, মনুষ্যের রিপু বল, প্রণয় বল, সংসারাসক্তি বল, শক্তি বল, যাহা বল, তখন সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সেই জঙ্গলে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। অসার চিন্তা লইয়া মনুষ্য ব্যস্ত, নচেৎ বাঙ্গলার এই যে স্বাধীন রাজ্য, এই রাজ্যে বাস করিয়া মনুষ্য সকল কষ্ট যন্ত্রনা ভুলিতে পারিত! চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, বৃক্ষশাখার উত্তমাঙ্গের সঙ্গে মিলিয়া মনের উল্লাসে ঐ যে সহস্র সহস্র পাখী মধু ঢালিতেছে, উহা শ্রবণে

কাহার হৃদয় না শোক দুঃখ, সংসারের তাড়না ভুলিতে পারে? বাঙ্গলার সম্পত্তি থাকিলে এই এক সম্পত্তি আছে, চিরপরাধীন বাঙ্গলায় শান্তির রাজ্য থাকিলে, স্বর্গ থাকিলে, এই এক মাত্র জঙ্গলে আছে। এখানে বৃক্ষ দোলে, পত্র নাচে, ফুল হাসে; সেই দোলনে, সেই নৃত্যে, সেই হাসির প্রণয়ে বিভোর হইয়া পাখী দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত মধু ঢালিতে থাকে। বাঙ্গলার যে মানব আজীবন সহরে থাকিয়া বাঙ্গলার একমাত্র সম্পত্তির সুখভোগ করিল না, সে মানব কখনও স্বাধীনতার আস্বাদন পায় নাই, এবং সে চিরদিন নরক যন্ত্রণাই ভোগ করিল।

ভদ্রেশ্বরে আর কোন কীর্ত্তিকলাপ না থাকিলেও সঙ্গীতপ্রবাহে মধুময় জঙ্গলগুলি শান্তির আলয় হইয়া রহিয়াছে। প্রভাবতী ধন ঐশ্বর্য্য, রাজভবন পরিত্যাগ করিবেন, আমাদের তাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু এই শান্তিভবনও তাঁহাকে ছাড়িতে হইবে, হায়, এ দুঃখ কোথায় রাখিব! রাজরাণী যিনি, তিনি আর দুদিন পরে পথের ভিখারিণী হইবেন, রাজভবনের সুখ সমৃদ্ধিতে যাহার শরীর পরিপোষিত ও প্রতিপালিত, দুদিন পরে দুঃখ কষ্টই তাঁহার শরীরের ভূষণ হইবে, এ কথা ভাবিলেও প্রাণে আঘাত লাগে।

ভালবাসা এক নূতন শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে যাহারা ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তাহাদের আর শোভা সৌন্দর্য্য বোধ থাকে না, ভালমন্দ বিচারশক্তি থাকে না। প্রেমের এমনি শক্তি, ইহাতে কুৎসিৎ ব্যক্তিকেও সুন্দর করিয়া দেয়,—কর্কশ স্বর মধুময় হয়। তুমি আমি জগতের যে সকল ব্যক্তিকে কুৎসিৎ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, ঐ সকল কুৎসিৎ ব্যক্তিরাও এক প্রেমের গুণে কত জনের নিকট পরম সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে। এক প্রেমে সংসারের শোভা সৌন্দর্য্য; এই প্রেম যাহার নিকট যেটীকে ভাল করিয়া চিত্রিত করে, তাহাই তাহার নিকট মনোহর বলিয়া বোধ হয়। এই প্রেমের জন্যই কেহ বা সুধাবিনিন্দিত সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমার বিমল জ্যোতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করেন; কেহ বা দিগন্তব্যাপী অমানিশার ঘোরতর অন্ধকারে অনন্তের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হন; কেহ বা বিভীষিকাময় ঘোর অরণ্যের বৃক্ষাচ্ছাদিত মনোরম্য স্থানে বসিয়া নির্জ্জন সাধন করিয়া কৃতার্থ হন; কেহ বা ভীষণ ঊর্ম্মিমালাময় নদী গর্ভে নৌসহায়ে বিচরণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। সংক্ষেপে এই প্রেমের জন্যই কাহার নিকট

কমলিনী, কাহারও নিকট শ্যামাসুন্দরীই সংসারের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া বোধ হয়, অথচ তাহাদের ন্যায় কুৎসিৎচিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রেমের মায়ায় আত্মসমর্পণ করিয়া রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ আজ পাগলিনীকেই সৌন্দর্য্যের একমাত্র আদর্শ মনে করিতেছেন,—প্রভাবতী তাহার নিকট কুৎসিৎ হইয়াছেন। আবার অন্যদিকে এই এক মাত্র প্রেমের মোহিনী মায়ার প্রভাবেই প্রভাবতী আজ রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের শত শত দোষকে উপেক্ষা করিতেছেন, সকল অপরাধ ভুলিতে পারিতেছেন। ধন্য প্রেম, ধন্য তোমার অপার শক্তি; তোমার প্রভাবেই আজ ভিখারিণী রাজরাণী হইবার জন্য অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে। আর যৌবন, ধিক তোমাকে, তুমি মানবকে যত শোভাতেই ভূষিত কর না কেন, প্রেম ভিন্ন ভিখারিণীকে রাজরাণী করিবার শক্তি তোমার নাই। লোকে বলে যৌবনের সৌন্দর্য্যে মনুষ্য ভুলিয়া থাকে, আমরা আজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বলি, প্রেমে মানবকে সুন্দর করিয়া দেয়, সুতরাং প্রেমেই মানবকে ভুলাইয়া রাখে। যে জন্মান্ধ, নয়ন ত তাহাকে রূপ দেখাইয়া মোহিত করে না; কিন্তু জন্মান্ধ কি কখনও মোহিত হয় না? প্রেম-নয়ন জন্মান্ধের হৃদয়ে যখন অমৃতের খনি আবিষ্কার করিয়া দেয়, তখন ঐ জন্মান্ধও অজ্ঞাতে অপরের হৃদয় রাজ্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ের ভূষণ কাড়িয়া লইয়া থাকে। আমরা বুঝিয়াছি, নয়ন সংসারের রূপ, শোভা সৌন্দর্য্য মানবের নিকট ধরুক বা না ধরুক, এক প্রেমের শক্তিতে স্ত্রী স্বামীর নিকট, পুত্র পিতার নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট, কুৎসিৎ হইয়াও পরম সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ধন্য প্রেম, ধন্য তোমার অপার শক্তি।

রাজার আদেশে পাগলিনী আজ আনীত হইয়াছে; আজই প্রভাবতীকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন; কারণ সূর্য্যোদয় হইলে আর চন্দ্রমা কি প্রকারে শোভা পাইবে? আজ রাজবাড়ীতে নবীন প্রেম-সূর্য্য উদিত, পরশোভায় ভূষিত, পর গৌরবে উজ্জ্বল চন্দ্রমা আজ মলিন, নিস্তেজ ও প্রভাহীন। কালের কি বিচিত্র গতি, কল্য যে পথের ভিখারিণী ছিল, আজ সে রাজরাণী হইবে, আর কল্য যিনি রাজরাণী ছিলেন, অদ্য তিনি পথের কাঙ্গালিনী হইবেন। প্রেম, এ তোমারই লীলা। সৌন্দর্য্যহীনা স্বামীপ্রাণা প্রভাবতী আজ রাজার আদেশে নির্ব্বাসিতা হইলেন। কাঙ্গালিনী কোথায় চলিলেন? যে স্থানে জীবনে মৃত্যু বিরাজ করে, সেই স্থানে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এলোকের নহে, বিবেকের শাসন !

কণ্টক পরিষ্কৃত হইয়াছে, এখন চল, পাঠক, আনন্দস্রোতে গা ঢালিয়া নৃত্য করি। দুঃখিনী প্রভাবতীকে বিদায় করিয়া দিয়াছি, প্রফুল্ল অন্তরে হাসিতে হাসিতে চল, বিকশিত প্রেমকুসুমের ঈষৎ হাসি দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। প্রণয়ের অস্ফুট ভাষা হৃদয়ে কত অমৃত ঢালিয়া দেয়, অলক্তরঞ্জিত অধরে বিজলীর ন্যায় হাস্য,—নয়নের কোণে ঈষৎ প্রস্ফুটিত হাস্য, আর বদনে ভালবাসার অস্ফুট আধ আধ ভাষা হৃদয়ে কত মধুই ঢালিয়া দেয় ! দুঃখিনীর দুঃখের কাহিনী শুনিতে কে যাইবে? সে কাহিনী লিখিতেই বা কাহার লেখনী ব্যস্ত হইবে? বঙ্গদেশে উপন্যাস লেখকের লেখনী যে আদর্শে পরিচালিত, ঐ হতভাগিনীর জীবনের কথা লিখিতে কে অগ্রসর হইবে? অগ্রসর হইলেই বা সে কাহিনীর শ্রোতা কই? সহানুভূতি কি বাঙ্গলায় আছে? বাঙ্গলার পাঠকের সহানুভূতি আছে প্রণয়ের কাহিনীতে !! হায়, অদ্বিতীয় প্রণয়চিত্র লেখকই যখন বাঙ্গলার উপন্যাস লেখকের অগ্রণী, তখন এপ্রকার কাহিনীতে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার পাঠকই বা কোথায়, লেখকই বা কোথায়? প্রণয়-বিহ্বল বাঙ্গলার কি দুর্দ্দশা !!

রাজা নাকি প্রেমের দাস, রাজা পাগলিনীর প্রেম-সাগরে আজ ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পাগলিনীকে হাতে ধরিয়া গৃহে লইলেন, শত শত ব্রাহ্মণকে টাকার স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল; তাহারা কেহ অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে, কেহ বা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গৃহে ফিরিল; ধর্ম্ম বল বা ন্যায় বল, এ সকল কথা লইয়া কেহই কোন আন্দোলন করিল না। এই প্রকারে হিন্দুসমাজের এক প্রকার বিবাহ হইয়া গেল, রাজা পরম সুখে গৃহে রত্নকে তুলিলেন। চুপে চুপে ভদ্রেশ্বরের ঘরে ঘরে রাজার নিন্দাবাদ ঘোষিত হইতে লাগিল;—কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের বিবেকের অস্ফুট ভাষা তাহার চরিত্রে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিতে লাগিল। প্রভাবতীর বিনিময়ে রাজা রূপ পাইলেন বটে, কিন্তু প্রভার কোমল ও

সরল হৃদয় কোথায় পাইবেন? প্রভাবতীর তুলনায় রাজা যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্যের ভরা পাইলেন বটে, কিন্তু প্রভাবতীর ভালবাসা পাইবেন কোথায়? ভালবাসার তুলনায় ঐ পাগলিনী আজ চন্দ্রের বিমল জ্যোতির নিকট খদ্যোতের আলোকের ন্যায়। সত্য নাকি অপ্রচ্ছন্ন থাকে না, প্রণয় রাজ্যের অসময় হইলেও প্রথম দিনেই রাজার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। প্রভাবতী গৃহে থাকিলে এই পাগলিনীই পরম সুখের বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু প্রভার অভাবে, পাগলিনীর কথায়, হাসিতে, ব্যবহারে, কিছুতেই রাজা সুখ পাইলেন না, তাহার হৃদয়ে প্রথমদিনেই আঘাত লাগিল। সমস্ত দিবস রাজা চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন, পাগলিনীর সহিত তেমন মন খুলিয়া কথা বলিতে পারিলেন না। পাগলিনীর আজ সুখের প্রথম দিন, কিন্তু পাগলিনীর অন্তরেও কেমন কেমন ভাব হইতে লাগিল,—ইহাপেক্ষা পূর্ব্বের অবস্থা ভাল বোধ হইতে লাগিল।

সে দিন কি তিথি ছিল, তাহা ঠিক নাই, কিন্তু রজনীতে চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে ভদ্রেশ্বরে উপস্থিত হইলেন,—ভদ্রেশ্বরের গৃহে গৃহে, জঙ্গলে জঙ্গলে, বৃক্ষে বৃক্ষে, পাতায় পাতায় আপন জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রমার জ্যোতি দেখিয়া কত ভাবুকের মনে কত কথা উপস্থিত হয়। আকাশে চন্দ্রমার কেলি দেখিয়া কেহ সংসারের রিপুর উত্তেজনায় মাতিয়া উঠে, কেহ বা ঈশ্বরের চিন্তায় বিভোর হইয়া নিস্তব্ধ রজনীতে তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হয়। রজনীতে ঐরূপ দেখিয়া কেহ প্রণয়ের গানে জগৎকে, মানব সমাজকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে, কেহ বা ঈশ্বর সঙ্গীত করিয়া জগৎকে এবং মানবসমাজকে স্বর্গে তুলিয়া দেয়। আর ঐ রশ্মি দেখিয়া—যাহার আনন্দের দিন, সে আনন্দে ভাসিতে থাকে, আর যাহার দুঃখের দিন, সে আরো বিষণ্ণ হয়। কিন্তু পশু পক্ষীর চিরকালই এক ভাব। আকাশে চন্দ্রমাকে হাসিতে দেখিলে তাহারা চিরকাল একই ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।

রজনী গাঢ়তর হইতে লাগিল, চন্দ্রমার জ্যোতি আরো উজ্জ্বল হইতে লাগিল। গ্রামের নিস্তব্ধতার সহিত বিমল জ্যোতি মিলিয়া রাজভবনে উপস্থিত। রাজা কি মনে করিতেছেন? রাজচক্ষে আজ নিদ্রা নাই, রাজভবন আজ শূন্য। প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনের ন্যায় রাজভবন আজ শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে। রাজা মনে করিতেছেন, ঐ চাঁদ কি প্রকার নিষ্ঠুর, আমি এ কলঙ্কিত মুখ লুকাই-

বার স্থান খোঁজিয়া পাইতেছি না, ঐ চাঁদ আবার নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যঙ্গ করে আমার কলঙ্ক গৃহে গৃহে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে। রাজার মনে হই-তেছে, ঐ চন্দ্রমা যেন আজ কেবল রাজার নিন্দাবাদ ভদ্রেশ্বরের গৃহে গৃহে ঘোষণা করিতেছে। এই সময়ে ভ্রমে বিহঙ্গকুল একবার কলরব করিয়া উঠিলে রাজা মনে করিলেন, উহারা আমাকেই নিন্দা করিয়া গালাগালী করিতেছে। রাজার চক্ষে নিদ্রা আসিল না, এই প্রকারে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। আকাশের মেঘ চন্দ্রমার কিরণ মাখিয়া ছুটাছুটী করিয়া, পৃথিবীর বায়ু বৃক্ষের পুষ্পের সৌরভে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে যেন কেবলই রাজার নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতেছে। রাজা আর কি ভাবিতেছেন? তাহার হৃদয়ের ভিতরে ও কে কথা বলিতেছে? অস্ফুট স্বরে অন্তরের মধ্যে কে যেন বলিতেছে,— কেন একাজ করিলে, কেন এ কাজ করিলে? কি নিদারুণ কথা, রাজার প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। পাঠক, তুমি আমি কি আনন্দ প্রকাশ করিব বল দেখি? রাজার অন্তর বিষে জর্জ্জরিত, মন ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। রাজার অন্তরে কেবল ঐ একই স্বর,—কেন একাজ করিলে,—কেন একাজ করিলে? রাজার উৎসাহ, আনন্দ, সুখ, সকল আজ নিস্তেজ, হৃদয় আজ অব-সন্ন, অন্তরের জ্বালায় রাজা অস্থির হইয়াছেন। নিদ্রার কি সাধ্য আজ রাজার চক্ষুকে আক্রমণ করিবে? রাজার মনে দারুণ যাতনা উপস্থিত হইল, তিনি অবশেষে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাবতী যেন তাহার হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া ফেলিল, কেবল প্রভাবতী, কেবল প্রভাবতী বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভা, তুমি কি রাজাকে ক্ষমা করিবে না? তুমি দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়াছ, কিন্তু রাজার এই কষ্ট কি দেখিবে না? তুমি দুঃখে পড়িয়াও প্রকৃত সুখে আছ, কারণ তোমার হৃদয়কে ত বিবেকের নির্দ্দয় বাক্য ক্ষতবিক্ষত করিতেছেনা? তুমি ত সুখেই আছ, কারণ তোমার হৃদয়ে ত অনুতাপানল প্রজ্জ্বলিত হয় নাই? প্রভা, তুমি একবার রাজভবনে এস, রমণীর হৃদয় লইয়া পুরুষের ন্যায় কেন কঠোর হইবে? স্বামীর প্রহার রমণীর হৃদয়ের ভূষণ, স্বামীর কর্কশ বাক্য সতীর হৃদয়ের ভালবাসার মধুর স্বর। কেন আজ দূরে রহিয়াছ?—প্রভা, একবার এস; আমি যে তোমাকে ভালবাসি, সে এই জন্য যে, তুমি বাস্তবিক কষ্টসহিষ্ণু রমণীর হৃদয় পাইয়াছ? নচেৎ কে তোমার যশ ঘোষণা করিত? তবে প্রভা একবার এস, রাজভবনে একবার পদার্পণ কর। রাজার কষ্ট একবার স্বচক্ষে দেখে যাও; আর পাগলিনীর কষ্ট

একবার অনুভব কর। তোমার জীবনের সুখ ত দিয়াছ, কিন্তু একবার পরীক্ষা করে দেখে যাও, যাহারা সুখসাগরে অবগাহন করিয়াছে, তাহাদের কি প্রকার কষ্ট। আজ পাগলিনীর অস্ফুট ক্রন্দন জগৎকে বলিতেছে,—কেন এ পথে আসিলাম ; আর রাজার গগণভেদী ক্রন্দনের ধ্বনি ঐ নিলর্জ্জ চন্দ্রমার রশ্মিকে ভেদ করিয়া উর্দ্ধে এই একই কথা প্রচার করিতেছে—কেন এ কাজ করিলাম? মনুষ্য বলিয়া থাকে, লোকের নির্যাতনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেই মানব রক্ষা পায়। লোকে বলে, অন্যায় কার্য্য করিয়া মনুষ্যের ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই হয়! কিন্তু মনুষ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি সহজ। গজেন্দ্রনারায়ণ আজ অর্থের সহায়ে লোকের হস্ত হইতে ত রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু তবু কেন তাহার মন সুস্থ হইতেছে না? একবার, দুবার, তিনবার, ক্রমাগত অন্তরের ভিতরে ঐ যে কর্কশ স্বর—কেন এ কাজ করিলে, বলিয়া রাজাকে তিরস্কার করিতেছে, একি মানবের স্বর? মানবের স্বর অন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না ; অথচ অন্তরের মধ্যে এ ভাব কেন? কেন মানব পাপ করিয়া শান্তি পায় না?—কেন মানব নিষ্কৃতি পায় না? অন্তরের মধ্যে ঐ যে প্রহরীর ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া শাসন করিতেছে, ও কে? মানব জানুক বা না জানুক, উহাই ধর্ম্মের আদেশ, উহাই ঈশ্বরের অস্ফুট বাণী, উহাই বিবেক। যতক্ষণ না অন্যায় কার্য্যের জন্য মানবের মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়, ততক্ষণ এই প্রহরী মানবের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে। মনুষ্য আর মনুষ্যকে কি শাসন করিবে? টাকার প্রলোভনে যে মনুষ্য ভুলিয়া ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেয়, সে মনুষ্য আবার পাপের কি শাসন করিবে? বিবেক চিরকাল ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া মানবকে পাপের রাজ্য হইতে রক্ষা করিতেছে, ইহার ভয়ে মানব ত্রাহি ত্রাহি শব্দে পাপের রাজ্য হইতে পলায়ন করিতেছে। বিশ্বেশ্বরের গুপ্তচর এই প্রকারে মানবকে শাসন করিয়া থাকে।

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের ক্রন্দনের ধ্বনি যখন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, তখন স্বপ্নের ন্যায় তিনি অনুভব করিলেন,—প্রভাবতী যেন তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, প্রভাবতী আবার গৃহে আসিয়াছেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় এ দিক ওদিক প্রভাবতীকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও পাইলেন না। শয়নকক্ষে পাগলিনী শয়ান রহিয়াছেন দেখিয়া চেতনশূন্যের ন্যায় বারম্বার তাহাকেই প্রভাবতী প্রভাবতী বলিয়া ডাকিলেন,

কিন্তু উত্তর পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই শয্যা হইতেই মৃদুস্বর বাহির হইল,—প্রভাবতী কাল আসিবেন, আজ আপনি সুস্থ হউন। রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের কর্ণে যাই পাগলিনীর স্বর প্রবেশ করিল, অমনি তিনি অচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের পরাক্রম।

কালের কি দুর্জ্জয় পরাক্রম। মনুষ্যের মন নাকি চঞ্চল, মনুষ্য নাকি ধৈর্য্য ধরিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতে অক্ষম, তাই কাল মানবের মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন দুর্জ্জয় পরাক্রম জগতে অপ্রতিহত রাখিতে সক্ষম হইতেছে। একবার, দুবার, তিনবার তুচ্ছ করিয়া সময়কে উপেক্ষা কর, দেখিবে তোমার উপর ঐ কাল কি একাধিপত্য বিস্তার করিবে। রাজা পথের ভিখারী হয়, জ্ঞানী মূর্খ হয়, ধার্ম্মিক ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন, বৈরাগী সংসার আসক্তির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দেন, এ সকল প্রতি দিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের ব্যাপার ; কিন্তু এ সকল হয় কেন ? মানব মনের দুর্ব্বলতায় প্রশ্রয় পাইয়া ঐ কাল ভীম রবে আসিয়া যখন মানবকে আক্রমণ করে, তখন মানব পূর্ব্ব সঞ্চিত সকল ধন পরিত্যাগ করে, ভিক্ষার ঝুলিকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ঐ কালের হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। কাল অগ্নির ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া মানবের গৃহের সকল রত্ন ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তুমি, আমি জগৎ সংসার প্রতিনিয়ত এই প্রকারে কালের হস্তে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছি। বিবেকের অস্ফুট বাণীর কি সাধ্য যে, মানবকে কালের পরাক্রমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে ? যদি কাল একবার প্রশ্রয় পায়, তবে সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ফেলে !

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ সামান্য মনুষ্য,—ধৈর্য্যহীন, চঞ্চল, বিবেকের শাসন ইহার নিকট পরাস্ত হইল। রাজার মনে দুর্ব্বলতার মৃদু মৃদু গতির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়া কাল আসিয়া রাজাকে গ্রাস করিল,—একদিন, দুদিন,

তিনদিন, ধৈর্য্যসহকারে ক্রমে ক্রমে কাল আপন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল। রাজা সময়ে প্রভাবতীর মধুর নাম, কোমল স্বভাব, অপরাজিত ভালবাসা, সকল ভুলিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে একটী শিশু প্রভার ক্রোড়কে উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার মমতা পর্য্যন্ত রাজা ভুলিতে লাগিলেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর আবার দিন, দিনরাত্রি, রাত্রিদিন ক্রমাগত রাজবাড়ীতে দরবার করিতে করিতে রাজার মনকে কাড়িয়া লইল; কাড়িয়া লইয়া ঐ যে পাগলিনী শয্যায় শয়ান, দুঃখে ও বিষাদে মলিন হয়ে পড়েছিল, উহাকে অর্পণ করিল;—কাঙ্গালিনী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। রাজার মনকে পাইয়া পাগলিনী আনন্দসাগরে ভাসিয়া উঠিল, সৌন্দর্য্য, রূপ ও যৌবন, সকলে মিলিয়া পাগলিনীকে তরঙ্গে নাচাইতে লাগিল। পাগলিনী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, একদিন ঐ সর্ব্বনাশী প্রভাবতীর রক্ত শোষণ করিয়া কৃতার্থ হব।

ভালবাসার রাজ্য কোথায়? অনেক গ্রন্থকার ভালবাসার রাজ্যকে যুবক ও যুবতীর অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহারা বলেন, যুবক যুবতীর অন্তরের মধ্যেই অকৃত্রিম প্রণয়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়। আমরা বলি, যুবক যুবতীর ভালবাসার মধ্যে স্বর্গের সৌন্দর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও সংসারের ভালবাসার তুলনায় তাহা হীনজ্যোতিবিশিষ্ট। যে ভালবাসায় মানবের মনকে জয় করিতে পারে না, মানবের হিতাহিত জ্ঞানকে লোপ করিতে পারে না, সংসারের চক্ষে সে ভালবাসা ভালবাসাই নহে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যুবক যুবতীর ভালবাসায় আত্মবিসর্জ্জন নাই,—সংসারের নরকের চিত্র নাই। মাখামাখী ভালবাসা,—যে ভালবাসায় আত্মবিস্মৃতি হয়, সে ভালবাসা রিপূন্মত্ত ব্যক্তি এবং যুবতীর মধ্যে। লিখিতে লজ্জা বোধ হয়, সংসারের এই প্রকার উন্মত্ত অনেক মানব বয়সের কথা বিস্মৃত হইয়া, রিপুর উত্তেজনায় অধীর হইয়া যখন নবীন ভার্য্যার নবসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন, তখন যশ,মান,ধন, ঐশ্বর্য্য, মনের নানাপ্রকার সৎপ্রবৃত্তি,এমনকি ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া মানব ভার্য্যার করকমলে আপনার মনকে আবদ্ধ করেন,—ঐ করের অঙ্গুলির ইঙ্গিতে উঠেন, উহার ইঙ্গিতে বসেন, ঐ অঙ্গুলির আদেশে স্নান আহার, ঐ অঙ্গুলির নির্দ্দেশে অন্য স্থানে গমন, বা অন্যের সহিত আলাপ করেন। এমন কি পঞ্চাশৎ বৎসর যাহার মস্তককে প্রদক্ষিণ করিয়া গিয়াছে, তাহাকে পর্য্যন্ত যখন এই প্রকার ষোড়শ

বৎসরের শিশু ভার্য্যার নিকট ধর্ম্ম, জ্ঞান,ঐশ্বর্য্য ও মান সম্ভ্রমকে বিক্রয় করিতে দেখি, তখন মনে করি, সংসারের মধ্যে ভালবাসার মর্ম্ম ঐ উন্মত্তই বুঝিয়াছে, ভালবাসার আসক্তিতে ঐব্যক্তিই বিভোর হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু লিখিতে লজ্জা বোধ হয়, ঐ স্থানের ভালবাসায় অন্যের মনরক্ষার্থ একজনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জিত হয়। এ সকল কথা আমরা কেন লিখিতেছি? রাজা বৃদ্ধ না হইয়াও রিপুর জ্বালায় কিপ্রকারে ঐ পাগলিনীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে সকল মনের সৎপ্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিলেন, আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা তাহাই জাগিতেছে। রাজা তটস্থ হইয়া ঐ কাঙ্গালিনীর নিকট দণ্ডায়মান,—মনের এই প্রকার সঙ্কল্প প্রণয়িনী যাহা বলিবেন, তাহাই করিবেন।

দশ দিন, পনর দিন, একমাস যাইতে না যাইতে ঐ কাঙ্গালিনী রাজরাণী হইলেন। এতদিন তবু একটু একটু লজ্জা ছিল,—একদিন রাজবাড়ীতে যে ভিক্ষা মাঙ্গিতে আসিত, সেই বাড়ীতে রাজরাণীর স্থান অধিকার করিতে পূর্ব্বে তাহার একটু সঙ্কোচ মনে হইত। ক্রমেক্রমে সে ভাব তিরোহিত হইল। পাগলিনীর আর বুঝিতে বাকী নাই যে, রাজা তাহার চরণেই আবদ্ধ হইয়াছেন। পাগলিনী সময় বুঝিয়া, ভাব বুঝিয়া রাজরাণীর আসন গ্রহণ করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন,—কাহার উপর? তাহার চরণে আবদ্ধ ঐ মত্ত হস্তী সদৃশ রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের উপর।

রাজা মধ্যে মধ্যে প্রভাবতীর নিকট এক এক খানি পত্র লিখিতেন, তাহা রাজরাণীর অসহ্য হইয়া উঠিল; রাণী ক্রোধ প্রকাশ করিয়া রাজাকে একদিন তিরস্কার করিলেন, রাজা ভয়ে পত্র লেখা বন্ধ করিলেন। রাজবাড়ী হইতে পূর্ব্বে লোকজন প্রভার নিকট যাইত, রাণী তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রভাবতীকে রাজা কাঙ্গালিনী করিয়া বিদায় করেন নাই,—প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে আরো দিতেন। রাজরাণীর চক্ষে তাহা সহ্য হইল না;—একদিকে টাকা প্রেরণ স্থগিত হইল,অন্যদিকে যে সকল দ্রব্য এবং যে অর্থ রাজা পূর্ব্বে প্রভাকে দিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। একদিন রাজা লোক পাঠাইয়া প্রভাবতীর শিশুকে বাড়ীতে আনিয়াছিলেন, সে জন্য তাহাকে কত লাঞ্ছনাই সহ্য করিতে হইল!! “শিশুকে পায়ের নীচে ফেলে দাও, গলা টিপে মেরে ফেল, না হলে আমি আজ তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ব

না, তোমাকে ছেড়ে যাব” এই প্রকার কর্কশ স্বরে রাজার প্রাণে আঘাত করিয়া ঐ সর্ব্বনাশী প্রফুল্ল অন্তরে রক্ত মাংস শোষণ করিতে লাগিল। মত্ত হস্তী মাহুতের লগুড়ের দ্বারা বিষম আঘাত সহ্য করিয়াও অবিচলিত ভাবে আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। রাজা আজ দাসানুদাস,—ঐ পাগলিনী রাজরাণী; ইহাই প্রণয়ের লীলা, ইহাই প্রণয়ের আত্ম বিসর্জ্জন!! এ একটী সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। এই প্রণয়ের মায়ায় মুগ্ধ মানব ধন, মান, জ্ঞান বুদ্ধি, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পশুবৃত্তিকেই জীবনের ভূষণ করিয়া থাকে। প্রতিনিয়ত মানব সমাজ এই প্রণয়গীতিতে বিভোর হইয়া রহিয়াছে,—ভালই বল আর মন্দই বল, ইহার মমতা অতি অল্প মানবই পরিত্যাগ করিতে পারে। সহস্র মুখে এই প্রণয়ের প্রতিবাদ কর, নিন্দা ঘোষণা কর, নিমেষ মধ্যে "সংসার গেল, সংসার গেল" এই শব্দ চতুর্দ্দিক হইতে উত্থিত হইয়া গগনে পরিব্যাপ্ত হইবে; তোমার আমার শব্দ কাহারও কর্ণে আর প্রবেশ করিবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসনে।

রাজা প্রভাবতীর বসতির জন্য, ভদ্রেশ্বর হইতে দুপ্রহর দূরে, পদ্মার তীরে শিবালয় নামক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ঐ শিবালয় রাজার বিলাসভবন ছিল। প্রভাবতীর সহিত একজন চাকর; এবং একজন গোমস্তা প্রেরিত হইয়াছিল। গোমস্তার প্রতি রাজার আদেশ ছিল,—প্রভাবতীর জন্য সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। পরিচারিকা কে, সে কেনই বা রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া ঐ কাঙ্গালিনীর আশ্রয়ে চলিল? পরিচারিকার নাম শান্তময়ী, প্রভাবতী শান্তি বলিয়া ডাকিতেন। শান্তি প্রভার বাল্যসহচরী, উহারই ক্রোড়ে প্রভার সরোজকুমার লালিত পালিত হইয়াছে। শান্তির পৃথিবীতে আর কেহই নাই,—প্রভাই এক সময়ে শান্তির সর্ব্বস্ব ছিল। আজকাল প্রভার অঞ্চলের নিধি সরোজকুমারই শান্তির পৃথিবীর সর্ব্বস্ব হইয়াছে। শান্তি সরোজকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। যে

রাজভবনে সরোজকুমার নাই, সে রাজভবন শান্তির নিকট শ্মশান। ঐ সরোজের মায়ায় শান্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক, অম্লানবদনে রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী হইবার জন্য প্রভার সহিত চলিল। ভৃত্য কেন চলিল? ভৃত্য মনে করিয়াছিল, কিয়দ্দিবস রাজার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য রাজ্ঞীর সেবা করিবে, পরে রাজ্ঞীকে পরিত্যাগ করিবে। গোমস্তার নাম শিবনারায়ণ, ঐ গোমস্তার চক্রান্তেই প্রভাবতী বনবাসিনী হইলেন; উহার অন্তর বিষময়, হৃদয় নির্দ্দয়তার প্রতিমূর্ত্তি। যে দিন প্রভাবতী রাজবাড়ী হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, সে দিন প্রভার কাঁদিতে কাঁদিতেই গেল। প্রভা এক২বার সরোজকে বক্ষে রাখিয়া হৃদয়োচ্ছাস নিবারণ করেন, আবার অস্থির হইয়া পড়েন!! সরোজ নিতান্ত শিশু, সে কিছুই বুঝে না, মাতা কেন কাঁদিতেছেন তাহা কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। শান্তি নৌকার ভিতরে সরোজকে ভুলাইয়া রাখিতেছে। সরোজের সকলি নৌকায় আছে;—শিশুর পৃথিবীর সকল সুখ জননীর অঞ্চলে, সেই জননী সরোজের নিকটে; সরোজের দ্বিতীয় ভালবাসার বস্তু শান্তি, সেও নিকটে, শিশুর আর অভাব কিসের? তবে মাতার চক্ষের জল দেখিয়া সময়ে সময়ে তাহার চক্ষু হইতেও দু একবার জল পড়িতেছে। শিবনারায়ণের কোন দুরভিসন্ধি ছিল, নচেৎ সে রাজ্ঞীর সহিত কখনও আসিত না। শিবনারায়ণ দুর্জ্জয় রিপুর উত্তেজনায় মত্ত হইয়া মনে কল্পনা করিয়াছিল, প্রভাবতীকে যদি বনবাসিনী করিতে পারি, তবে তখন প্রভাবতী আমারি হইবে। কোন নিগূঢ় কারণে রাজার মনকে বিষাক্ত করিয়া প্রভাকে বনবাসিনী করিয়াছে, শেষোক্ত উদ্দেশ্যে প্রভার নৌকায় ঐ হতভাগা পা ফেলিয়াছে। দুর্জ্জয় রিপু যে মানবকে একবার বশ করিতে পারিয়াছে, সে মানব পশু অপেক্ষাও নীচ।

শিবালয় ভদ্রেশ্বর হইতে মাত্র দুপ্রহরের পথ, কিন্তু দুষ্ট শিবনারায়ণ চক্রান্ত করিয়া তিন দিন নৌকাখানি পদ্মার তরঙ্গের মধ্যে আন্দোলিত করিল। প্রথম দিন প্রভার চক্ষের জলে যখন বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে, সেই সময়েই ঐ পাষণ্ড প্রলোভনের চিত্র প্রভাকে দেখাইতে লাগিল,—"রাজ্ঞি, আপনি রাজরাণী, আজ রাজা আপনাকে চরণে ঠেলিয়াছেন, রাজার মমতা পরিত্যাগ করুন, আবার নূতন সুখের ঘর বাঁধুন;—পৃথিবীময় সুখ স্বচ্ছন্দ, কেন কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন? প্রথম দিন প্রভাবতী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিনে প্রভা ঐ হতভাগার অভিসন্ধি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, বুঝিতে

পারিয়া উহার সহিত কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত তাহাতে আরো মাতিয়া উঠিল, মনে করিল রাজ্ঞী অভিমান করিয়াছেন, বলিল,—আপনি যদি আমার সহিত কথা না বলেন,তবে এই পদ্মার স্রোতের মধ্যে আমি ডুবিয়া মরিব। প্রভাবতী মনে ভাবিলেন,যাহার ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়,সে মরিবে,আমি তজ্জন্য কি করিব? অন্যায় কার্য্য করিয়া কখনই এক জনের প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে। এই ভাবিয়া প্রভাবতী কথা বলিতে সম্মত হইলেন না। শিবনারায়ণ ভুলাইয়া শান্তিকে হাত করিল, শান্তি নির্ব্বোধ সে কিছুই বুঝে না, সে বলিল, “ভালইত,গোমস্তার কথা শুন্‌লে দোষ কি?” প্রভাবতী শান্তির মুখে এই কথা শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে অধীর হইয়া বলিলেন,—“শান্তি, তোর কি আর মর্‌বার স্থান নাই,এই পদ্মায় ডুবে মর্, আমার কাটা ঘায়ে আর আঘাত করিস্‌নে।” শান্তি প্রভার কথা শুনিয়া চুপ করিল বটে, কিন্তু শিবনারায়ণ শান্তির মন চটাইবার চেষ্টায় রত হইল, বলিল,—শান্তি, তোকে যে পদ্মায় ডুবে মর্‌তে বলেছে, তার সঙ্গে এখনও আছিস্? একবার, দুবার, তিনবার বলিতে বলিতে, ভয় দেখাইতে দেখাইতে, শান্তির মনও বিরক্ত হইল। এই প্রকারে শিবনারায়ণ ক্রমে ক্রমে প্রভাবতীর জীবনকে কলঙ্কেও নানা প্রকার কষ্টে ডুবাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তিন দিবস পরে শিবনারায়ণের আদেশে নৌকা শিবালয়ের ঘাটে সংলগ্ন হইল। প্রভাবতী একমাত্র সরোজকুমারকে লইয়া তীরে উঠিয়া আশ্রয়ে গমন করিলেন। শিবনারায়ণ নৌকা হইতেই অভিমানে বিদায় লইল, শান্তি এবং ভৃত্যকে ইতিপূর্ব্বেই ঐ হতভাগা চটাইয়া দিয়াছে,তাহারা উভয়ে প্রভার মায়া ছাড়িয়া ফিরিয়া চলিল। প্রভাবতী কষ্ট দুঃখের সেবা করিতে শিবালয়ে পা ফেলিলেন।

শিবালয়ের ভবনে যাইয়া প্রভাবতী দেখিলেন, গৃহে সকল প্রস্তুত রহিয়াছে, রাজা যাহা আদেশ করেন নাই, তাহা পর্য্যন্ত সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার কারণ এই, প্রজাবর্গ ভিতরের সংবাদ কিছুই জানিত না, তাহারা রাজ্ঞীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি আনিয়া রাজ্ঞীর জন্য রাখিয়াছে। প্রভাবতী যখন শিবালয়ে পৌঁছিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে অনেক প্রজা আসিয়া রাজ্ঞীকে নজর ও ভেট্ দিতে লাগিল; প্রভাবতী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। প্রভাবতী পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বরের ভবন পরিত্যাগ করিবার সময় যে প্রকার চিন্তাকুল হইয়া-

ছিলেন, সে চিন্তা গেল, শিবালয় তাঁহার নিকট বড়ই মধুময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পোদ্যানের মধ্যে ছোট একটী দ্বিতল গৃহ প্রভাবতীর আশ্রয়, ঐ গৃহের পশ্চিম দিক দিয়া পদ্মার প্রশস্ত বক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রভাবতী শিবালয়ে কিয়দ্দিবস শান্তিতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাণীর সৎব্যবহারে অনেক প্রজা বশীভূত হইল। প্রভা আপন পুত্র সরোজকুমারের ন্যায় সকল প্রজাকে ভালবাসিতে লাগিলেন, প্রজাবর্গ প্রভাবতীকে মাতৃতুল্য জ্ঞানে ভক্তির সহিত দেখিতে লাগিল। শিবালয়ে এই প্রকারে প্রভাবতীর একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে!

ক্রমাগত দুমাস পর্য্যন্ত শিবনারায়ণ প্রভাবতীকে হস্তগত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইল না, তখন বিবিধ উপায়ে প্রভাবতীকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রভার বিপদের আর কি বাকী আছে যে, তাহার ভয়ে প্রভা আপনার জীবনের ভূষণ সতীত্ব বিসর্জ্জন দিবেন? বাহিরের সুখ সচ্ছন্দতা প্রভার অন্তরের জ্বালা কি নিবাইতে পারিয়াছে? প্রভার অন্তরের জ্বালা যদি না থাকিত, তাহা হইলে পতিব্রতাচারিণী হইয়া কখনও থাকিতে পারিতেন না। রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার প্রতি যতই নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করুন না কেন, তিনি দিন রাত্রি কেবল রাজার কুশল কামনা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বেই প্রভাবতী শক্তি-পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন; মধ্যাহ্নে যখন ত্রিপত্র বিল্বদলে অর্ঘ অর্পণ করিতেন, তখন মা ভগবতীর নিকট কেবল স্বামীর কুশল প্রার্থনা করিতেন। পূজা না করিয়া প্রভা কখনও জলগ্রহণ করিতেন না; প্রভা পূজার সময়ে একখানি চেলির বস্ত্র পরিধান করিতেন, কপালে সিন্দুর ফোটা কখনও দিতেন না, তবে পূজার সময়ে যে রক্ত চন্দনের ফোটা দিতেন, তাহা কখনও মুছিয়া ফেলিতেন না। মাতার চরণে অর্ঘ দিবার সময়ে কেবল প্রভার মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা যাইত।

সেই শিবালয়ের ক্ষুদ্র গৃহে, ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বরী শক্তির আরাধনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজবাড়ী হইতে পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্যাদি আসিত, তাহা ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইল। কিন্তু তাতে প্রভার ভাবনা কি? যাহার ভালবাসায় শত২ সন্তান আবদ্ধ, তাহার সংসারের দ্রব্যাদির জন্য আবার ভাবনা কি? রাজবাড়ী হইতে দ্রব্যাদি, টাকা কড়ি আসা বন্ধ হইলেও প্রজাদিগের সাহায্যে প্রভার দিন ভালভাবেই যাইতে লাগিল। রাজা পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে প্রভার নিকট এক এক খানি পত্র লিখিতেন, সময়ে তাহাও বন্ধ হইল। প্রজারা রাণীর এ অভাব পূরণ করিতে পারিল না; প্রভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এ কষ্টও সহ্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ প্রভাবতী সম্বাদ পাইলেন যে, রাজা পীড়িত হইয়াছেন; প্রভার মুখ অমনি মলিন হইল, মন সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। যে সকল প্রজারা প্রভাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়া সকলি বুঝিতে পারিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া একদিন রাজ্ঞীকে রাজবাড়ীতে লইয়া গেল। কিন্তু হায়, সেই পাগলিনী এমন লাঞ্ছনা করিল যে, রাজবাড়ীতে যাইতে না যাইতে প্রভাকে ফিরিয়া আসিতে হইল;—রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, পাগলিনীর ঝাঁটার আঘাত সহ্য করিয়া প্রভাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। সেই সময়ে প্রভাবতী যদি প্রজাদিগকে সমস্ত খুলিয়া বলিতেন, তাহা হইলে প্রভার কপাল ফিরিয়া যাইত, সকল প্রজা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিত, কিন্তু প্রভা অতি কষ্টে চক্ষের জল গোপন করিয়া নৌকায় উঠিয়া শিবালয়ে আসিলেন।

এদিকে শিবনারায়ণ অন্তঃপুরে দরবার আরম্ভ করিয়া নব রাজ্ঞীকে বলিল, "রাজা রোগে কাতর, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিবার শক্তি নাই; তোমার উন্নতিই আমার জীবনের এক মাত্র কামনা; প্রভাবতী শিবালয়ে পরম সুখে আছেন, অনেক প্রজা তাহারই পক্ষপাতী, কালে তোমার বিষয় সম্পত্তি সকলি তাহার হস্তে যাইবে, সাবধান হও, আপন ইষ্টসাধনায় প্রবৃত্ত হও। আজও তোমার সন্তান হয় নাই,—প্রভাবতীর সন্তানকে বিনষ্ট কর, শিবালয়ের রাজত্ব বিনাশ কর, প্রভাবতীকে ভিখারিণীর বেশে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেও।" শিবনারায়ণের মুখে দৈববাণীর ন্যায় এই সকল কথা শুনিয়া পাগলিনী চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া দেখিয়া ভাবভঙ্গিতে অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিলেন, উহার প্রসাদেই তিনি

রাজরাণী হইয়া কত সুখে শান্তিতে রহিয়াছেন, বলিলেন, তাহাই হইবে, আপনি এই রাজবাড়ীতে অবস্থিতি করুন, আপনার কোন আশঙ্কার কারণ নাই, ক্রমে সকলি হইবে। শিবনারায়ণ পূর্ব্বে অন্য স্থানে থাকিয়া রাজবাড়ী কর্ম্ম করিত, এই দিন হইতে রাজবাড়ীতে আড্ডা স্থাপন করিল।

রাজার রোগ যথাসময়ে আরোগ্য হইলে পাগলিনী এক দিন অভিমান করিয়া বসিলেন;—চোক রাঙ্গাইয়া, গাল ফুলাইয়া রাজরাণী রাজাকে বলিলেন,—যতদিন প্রভাবতীকে তুমি ভিখারিণীর বেশে শিবালয় হইতে তাড়াইয়া না দিবে, ততদিন তোমার সহিত কথা পর্য্যন্ত বল্‌ব না।

রাজা তাহার কথায় কোন উত্তর না করিয়া মৌনভাবে রহিলেন।

এই সকল ঘটনার পর একদিন প্রভাবতী দুপ্রহরের সময় গৃহকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সরোজকুমারের চিৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে প্রকার স্বর বাছার মুখে আর প্রভা কখনও শুনেন নাই। তিনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া দেখিলেন, সরোজ কাটা ছাগলের ন্যায় বাগানের মধ্যে মৃত্তিকায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, সর্ব্বশরীর রক্তে প্লাবিত! বাছার আর কথা বলিবার শক্তি নাই, উঠিবার শক্তি নাই, প্রাণটা শরীরকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে!! প্রভা, এ কি সর্ব্বনাশ;—তোমার একমাত্র অঞ্চলের ধন ছিল, তাও বুঝি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়! প্রভা ছুটিয়া যাইয়া সরোজকে ক্রোড়ে করিলেন; কিন্তু সরোজ আর মাতার আদর উপভোগ করিতে পারিল না। প্রভাবতী, সরো, সরো বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, এক একবার বাছার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন, এক একবার বক্ষে ধারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সরোজকুমার আজ মাতার কোন ব্যবহারেরই উত্তর দিল না, কেবল আপন শরীরের রক্ত দিয়া মাতার শরীরকে সিক্ত করিতে লাগিল। প্রভাবতী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—সরো, তুইও কি তোর দুঃখিনী মাকে ছেড়ে গেলি, আমি কি করে থাক্‌ব, সরো, সরো, কথা বল্‌, আমার প্রাণ ফেটে যায় যে, বলিয়া চিৎকার করে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া নিকটস্থ কৃষকেরা ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রভাবতী বলিতে লাগিলেন,—আমার একমাত্র অঞ্চলের ধন ছিল, তার মুখের পানে তাকায়ে ছিলাম, তাও বুঝি বিধাতার প্রাণে সইলো না, এই বলিয়া সরোজকে ক্রোড়ে করিয়াই

আছড়িয়া পড়িলেন। কৃষকেরা চক্ষের জলে ভাসিয়া মাতার সহিত কাঁদিতে লাগিল। প্রভার সরোজ জন্মের মত মাতার ক্রোড়কে শূন্য করিয়া চলিয়া গেল; মৃত্তিকার শরীর লইয়া প্রভা ধরা শয্যায় পড়িয়া রহিলেন!

আর কি লিখিতে ইচ্ছা করে? অবিশ্বাসীর অন্তর পর্য্যন্ত যে সময় চিন্তনে কম্পিত হয়, ভাবিতে ভাবিতে মন অবসন্ন হয়, আর কি সে সময়ের বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হয়? সত্য ঘটনা লিখিতে বসিয়াছি, না লিখিলে নয়, কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যের শরীরে আর সয় না। আমাদের আজ ইচ্ছা হয় কেবলই প্রভার সহিত বসিয়া কাঁদি, পুত্রহীনা প্রভাবতী মৃত সন্তানকে লইয়া যে প্রকার বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন, ইচ্ছা হয় জ্ঞান বুদ্ধি সকল ডুবাইয়া দিয়া তাহার সহিত সেই প্রকার ক্রীড়া করি। আর ইচ্ছা হয় যে পাষাণহৃদয় হতভাগার হস্ত এই নবনীত সদৃশ কোমল অঙ্গে আঘাত করিয়াছে, তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমিতলে ফেলিয়া পাদদলিত করি। মনুষ্যের হৃদয় লইয়া পুস্তক লিখিতে চেষ্টা করা কি বিড়ম্বনা!

সে দিন প্রভার সেই ভাবেই গেল, ক্রোড়ে মৃত সন্তান, শরীর রক্তময়! কৃষকেরা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল; কোন প্রকারেই প্রভার ক্রোড় হইতে মৃত সন্তানকে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। প্রভার আর কি আছে যে, তাহার মমতাতে সরোজের শরীরকে ভস্ম করিতে দিবেন? জননীর হৃদয়ে কত সয়? সে দিন গেল, সে রাত্রি গেল, অনাহারে অনিদ্রায় প্রভা মৃত সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রহিলেন। সরো কি মৃত? প্রভার মনে হইতেছে সরোজ মরে নাই, নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে,—আবার জাগিবে, আবার মা বলিয়া ডাকিবে, আবার হাতের দ্রব্য কাড়িয়া খাইবে, আবার মুখ চুম্বন করিবে!! হায় হায়, প্রভা কি উন্মত্ত হইলেন? প্রভা কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝিতেছেন না। তারপর দিন এক একবার কৃষকেরা প্রভাবতীকে শান্তনা দ্বারা বুঝাইবার জন্য আসিতে লাগিল, কিন্তু প্রভা বলিতে লাগিলেন,—'তোরা দূর হ' আমার সরোজকে কখনও দিব না, আমি সরোকে নিয়ে চিরকাল থাক্‌ব। কৃষকেরা সে দিনও পরাস্ত হইল। পরদিন প্রভার চক্ষে যাই একটু তন্দ্রা আসিল, অমনি নৃশংস কৃষকেরা প্রভার ক্রোড় শূন্য করিয়া সরোজকুমারকে শ্মশানে ভস্মীভূত করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী বেশে।

রাজবাড়ীতে যথাসময়ে সরোজকুমারের মৃত্যুসম্বাদ পৌঁছিল। এই সম্বাদে রাজরাণীর হৃদয়ের মধ্যে আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল, রাজা স্বয়ং অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন, বাহিরে অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে পাষাণ সদৃশ জনক জননীর হৃদয়ও বিগলিত হইয়া থাকে; রাজা মর্ম্মে বড়ই পীড়া পাইলেন। তিনি আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া প্রভাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। রাজার আর সন্তান নাই,—আর অমূল্য প্রেম-পুত্তলি নাই। রাজা শিবালয়ে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এমন সময়ে শিবনারায়ণের ইঙ্গিতে রাজ্ঞী ক্রোধাবতার হইয়া উপস্থিত হইলেন,—হস্তে চর্ম্ম-পাদুকা। রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "রে নির্ব্বোধ, রে দুরাচারি, তোর কি আপন পর জ্ঞান নাই, যাকে একেবারে বর্জ্জন করেছিস্, কোন্ মুখে আবার তার নিকটে যাচ্ছিস্? এই পাদুকার আঘাতে তোর ভালবাসার পুরস্কার দেব, ঐ সর্ব্বনাশীর প্রতি অনুরাগের সাধ মিটাব।" এই বলিয়া ভীমরূপিনী বাম হস্তে রাজার কেশাকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পাদুকা দ্বারা দুই চারিবার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন; রাজার শরীরে যেন পুষ্প-বৃষ্টি হইল। রিপুপ্রধান জীবন শোক সন্তাপ ভুলিয়া হাত যোড় করিয়া ক্রন্দনস্বরে বলিল,—আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর, আর কখনও এমন কর্ম্ম করব না! এই প্রকার শাসনে রাজার স্বভাবের উপর রাজ্ঞীর আধিপত্য বিস্তৃত হইল, রাজার শিবালয়যাত্রা বন্ধ হইল। কেবল তাহা নহে, রাজ্ঞীর নিকট রাজা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন,—দুই দিবসের মধ্যে প্রভাবতীর সমস্ত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ভিখারিণীর বেশে শিবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

যাহা মনুষ্যের চক্ষে সয় না, তাহাও বুঝি দেবতাদের চক্ষে সয়! হায়, প্রভাবতীর ভিখারিণীর বেশ ধারণের আর কি বাকী আছে? শিবালয়ে এমন কি

সুখের বস্তু আছে যে, তার পানে তাকাইয়া প্রভা আপন পুত্রের মমতা ভুলিতে পারিবেন? পদ্মার প্রশস্ত বিস্তৃতিতে অসংখ্য অসংখ্য তরঙ্গ নৃত্য করিতেছে,—সূর্য্যের রশ্মিতে সেই তরঙ্গ মণি মাণিক্যের ন্যায় জ্বলিতেছে, এ দৃশ্য কি প্রভার হৃদয় মনকে কাড়িয়া লইতে পারিয়াছে? পত্রের অন্তরালে প্রস্ফুটিত কুসুমের হাসা দেখিয়া কি প্রভার হৃদয় নৃত্য করিতেছে? শিবালয়ের কৃষকেরা প্রভার বড় ভালবাসার পদার্থ, আজ তাহাদের বাক্যসুধা কি প্রভার হৃদয় মনে শান্তি দিতে পারিতেছে? প্রভা ভদ্রেশ্বরের নির্জ্জন জঙ্গলের পাখীর গানে সদাই প্রফুল্ল থাকিতেন, আজ তাহাতেও কি আর প্রভার মনকে ভুলাইতে পারে? সকল আজ প্রভার নিকট শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।—প্রভা সকল ভুলিয়া সরোজকুমারের শ্মশানে পড়িয়া রহিয়াছেন। শিবালয়ের ক্ষুদ্র রাজ্য আজ প্রভার নিকট শ্মশান হইয়াছে,—পাখীর মধুর গান পেচকের স্বর অপেক্ষাও কর্কশ হইয়াছে,—পদ্মার তরঙ্গের লীলা মরুভূমির ঘূর্ণিত বালুকারাশির ন্যায় নীরস হইয়াছে! প্রভাবতীর গম্ভীর মূর্ত্তি আরো গম্ভীর হইয়াছে,—মুখে হাসি নাই, শরীরের দিকে দৃষ্টি নাই, আহারের দিকে দৃষ্টি নাই, কপালের এক মাত্র শোভা রক্ত চন্দনের ফোটা নাই, পূজা-অর্চ্চনা সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রভা ভিখারিণী হইয়াছেন,—প্রভা কাঙ্গালিনী হইয়াছেন,—জীবনের সকল সুখের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন; তবে আবার কেন? প্রভা কি নবরাজ্ঞীর সম্পদের পানে কুদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন? তবে কেন রাজ্ঞী আজ এই আভরণশূন্য কাঙ্গালিনীর আঘাতের উপর আবার আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? মনুষ্যের চক্ষে ইহা সয় না, কিন্তু দেবতারা এই লীলা খেলা দেখিতে উল্লসিত হন, তাই তাঁহারা অন্তরালে থাকিয়া থাকিয়া, একজনকে কাঁদাইয়া, আর একজনকে হাসাইয়া সুখের তরঙ্গ গণনা করেন। হায়, হায়, এমন যে প্রেমপূর্ণ মনুষ্যের হৃদয়, তাহাও এরূপ ঘৃণিত জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত হয়!!

প্রভাবতীকে কাঙ্গালিনী করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও ঐ নব রাজ্ঞীর মনের সাধ মিটিল না,—তিনি লোকের কুমন্ত্রণায় প্রভাবতীকে শিবালয়ের ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং রাজাকে লইয়া শিবালয়ে উপস্থিত হইলেন। পাগলিনীকে নব নব ভূষণে ভূষিত দেখিয়া এই বিষাদের সময়েও প্রভাবতীর মলিন মুখ প্রফুল্ল হইল,—এক দিন যাহার জন্য কত কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, আজ তাহার মুখে সুখের চিহ্ন দেখিয়া প্রভার কতই আনন্দ

হইতে লাগিল। প্রভাবতী সাদরে পাগলিনীকে গৃহে গ্রহণ করিলেন,কত প্রকারে ভগ্নীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"বোন, সুখে আছ ত, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করি, চিরকাল এই প্রকার সুখে থাক। স্বামীর হৃদয়ের ভূষণ তুমি,তোমাকে দেখিলেও আমার প্রাণ শীতল হয়,এস বোন,তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি।" আবার বলিলেন,—"আমার যে এত কষ্ট, তা সকলি তোমাকে দেখে ভুলেছি,—আমার সরোজকুমারের শোকে আমি অস্থির হয়েছি, সেই শোক নিবারণ কর্‌তে তুমি এসেছ? এস,বোন,তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করে আমার সকল জ্বালা দূর করি।" কাঙ্গালিনী প্রভাবতী রাজ্ঞীকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য যাই কর প্রসারণ করিলেন, অমনি রাজ্ঞী বলিলেন,—ছুঁস্‌নে,—তোকে স্বামী যখন ত্যাগ করেছেন, তখন তুই আমার কে? দূর হ। আজ তোকে এ বাড়ী হতে দূর করে দিয়া স্বামীকে লয়ে আমি এখানে থাকৃব।

প্রভাবতীর নয়ন প্রান্তে জল ছল ছল করিতে লাগিল, অঞ্চলের দ্বারা চক্ষু মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—স্বামীর সহিত তুমি এখানে থাকৃবে, সে ত সুখেরই কথা, থাক, আমি সরোজের ঐ শ্মশানে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাব।

রাজ্ঞী বলিলেন,—কি, ঐ শ্মশানে? তুই স্বামীর জীবনের অমূল্য রত্ন সরোজকুমারের জীবন নাশ করেছিস্, আজ ভালবাসা দেখাবার জন্যে আবার স্বামী স্বামী বলে নেকামি আরম্ভ করেছিস্, তোর সকল দুষ্টমি আজ ভেঙ্গে দেব! তোকে এরাজ্য হতে দূর করে দেব।

প্রভাবতী বলিলেন,—কেন বোন, আমার প্রাণে আর আঘাত কর? উঃ আমার প্রাণের সরোজকে আমি মেরেছি! বলিতে বলিতে প্রভাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, অবিরল ধারায় চক্ষের জল মৃত্তিকায় পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া তিনি পুনঃ বলিলেন,—আচ্ছা বোন, তুমি সুখে থাক, আমার আর কাজ কি? স্বামী সুখে আছেন জানিতে পারিলেই আমি সুখে থাকৃব। বোন, তুমি আমার হৃদয়ের রত্নকে অবহেলা করো না; আমার জীবন তোমার হাতেই সঁপে দিয়া আমি চলিলাম।

প্রভাবতীর আর অপেক্ষা করা ভাল দেখায় না ভাবিয়া, তিনি আস্তে আস্তে আপনার জীবনের একমাত্র আশ্রয় শিবালয়ের সেই ভবনের মমতা পরিত্যাগ

করিলেন। জন্মের মত রাজার সহিত একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি রাজার সম্মুখে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া অমনি রাজ্ঞী বাধা দিলেন। কি ভাবিয়া রাজার মনে একটু দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি বলিলেন,—"একবার আসিতে দেও, জন্মের মত যে যাইতেছে, তার সহিত আবার বিবাদ কেন?" প্রভাবতী রাজার সম্মুখীন হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাক্‌রোধ হইল, সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে এমন এক-প্রকার আবেগ চলিল যে, প্রভাবতী বারম্বার সরো,সরো বলিতে বলিতে রাজার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

রাজা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, অথচ কিছুই করিবার শক্তি নাই, সমস্ত স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া গোলাম হইয়াছেন, তিনি স্তম্ভিত ভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী এতাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,— তোর পক্ষে সকলি সম্ভব, জানিস্‌নে যে আমার হাতে তোর সর্ব্বস্ব? ঐ রঙ্গ ছেড়ে দিয়ে এখন ইহাকে শীঘ্র এবাড়ী হতে দূর করে দে।"

এই প্রকার কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার প্রাণ আরো অস্থির হইল, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। রাজ্ঞী প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া বলিলেন,—এখনই তুই এ বাড়ী হতে দূর হ, তোর জন্য আর মায়া দয়া কি? তুই কলঙ্কিনী, পতির ভালবাসার আশা আর করিস্‌নে, দূর হ।

প্রভাবতীর হৃদয় মন বিষাদে অবসন্ন হইল, অতি কষ্টে স্বামীর নিকট হইতে গৃহান্তরে গমন করিলেন, এবং ক্ষণকালের মধ্যে ঐ শিবালয়ের ভবন পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আকাশ, পৃথিবী, সকল তাঁহার নিকট অন্ধকারযুক্ত বোধ হইতে লাগিল; সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর কল্যাণ কামনা করিতে করিতে, একমাত্র চক্ষের জলকে সম্বল করিয়া প্রভাবতী অদৃশ্য পথে দেহযষ্টি খানিকে চালাইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সেই সুশীলা?

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যিনি রাজরাণী হইয়াছেন, তিনি কে, পাঠক, তোমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে? তবে শুন। হরিহর কারাগারে যাইবার সময় জনৈক বন্ধুকে বলিয়া গিয়াছিলেন, বসন্তকুমারীর অনিষ্ট করিতে বিশিমত চেষ্টা করিবে। সেই বন্ধু জ্ঞানচন্দ্রের সরকারে যাইয়া চাকরি আরম্ভ করিল। বসন্তকুমারী প্রভাবতী হইয়াছেন, জ্ঞানচন্দ্র গজেন্দ্রনারায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছেন। প্রভাবতী এবং গজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে অনুভব করিয়া প্রথমে হরিহরের বন্ধু মনস্কামনা পূর্ণ করিবার কোন সুযোগ পাইল না, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? সে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিল; অনেক দিন এই ভাবে দেখিতে দেখিতে গত হইল; পরে অনুসন্ধান করিয়া একটী পাগলিনীকে ভদ্রেশ্বরে আনিয়া রাখিল, মনে ভাবিয়াছিল, কোন প্রকারে রাজার মন যদি ইহার প্রতি অনুরক্ত হয়, তবেই সকল বাসনা পূর্ণ হইবে। কালে সে বাসনা পূর্ণ হইল। কি প্রকারে রাজার মন পাগলিনীর প্রতি অনুরক্ত হইল, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ঐ পাগলিনী কে?—হরিহরের প্রাণতোষিণী কুলীন কন্যা সুশীলা। ঐ বন্ধু কে? দ্বিতীয় খণ্ডে ইনিই শিবনারায়ণ নামে উক্ত হইয়াছেন। সুশীলা কিছুদিন দুঃখের বোঝা বহন করিয়া রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; উন্মত্তাবস্থায় সুশীলার কষ্টের সীমা ছিলনা। দুঃখ চিরদিন কি কাহাকেও মলিন করিয়া রাখিতে অবতীর্ণ হয়? সুশীলা একদিন দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বেড়াইতেন, আজ তাঁহার দ্বারে কত ভিখারী ও ভিখারিণী ফিরিতেছে। সুশীলার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে, সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে।

সুশীলা চতুর মেয়ে,—ভালবাসার বলে আপন রাজ্য কি প্রকারে বিস্তার করিতে হয়,—কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানেন। পূর্ব্বে হরিহর বাবুকে সতিনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া একাকিনী আধিপত্য বিস্তার

করিয়াছিলেন, এক্ষণে গজেন্দ্রনারায়ণকে সতিনের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাকিনী সুখের সাগরে সাঁতার দিয়া কেলি করিতেছেন। সুশীলা চতুর মেয়ে,—অন্তরের মধ্যে শলাকা বিদ্ধ করিয়া কি প্রকারে রক্ত বাহির করিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানেন। পাঠক, তুমি দুঃখিত হইবে কি? সুশীলার প্রতি তোমার পূর্ব্বে বড় ভাল ভাব ছিল;-কিন্তু আমাদের কি ভাল ভাব ছিল না? রমণী জীবনের সত্য কাহিনী, যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি, ভাল মন্দ বিধির হাতে, আমরা কল্পনা করিয়া কোন চিত্র সৃষ্টি করিতে বসি নাই। সুশীলার পরিণাম যে এই প্রকার হইবে, তাহা মানবের কল্পনায়ও উদিত হয় না। অনেকে হয় ত সুশীলার বংশে দোষারোপ করিবেন,—পিতা মাতাকে গালাগালী করিবেন। সময়ে সময়ে বংশদোষে সন্তানের স্বভাব যে মন্দ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু সুশীলা এত দিন পরে কেন বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন,—এতদিন পরে কেন পিতা মাতার যশ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পূর্ব্বে স্বামী হরিহরের ভালবাসায় ও ভয়ে সর্ব্বদাই সৎপথে থাকিতে চেষ্টা করিতেন; এক্ষণ সে ভালবাসাও গিয়াছে, সে ভয়ও গিয়াছে। সুশীলার উন্মত্তাবস্থায় সুশীলার পুনঃ জন্ম হইয়াছে;—এ সুশীলা আর সে সুশীলা নহে।

হতভাগিনী বসন্তকুমারী—আমাদের প্রভাবতীর কপালে আর বুঝি সুখ ছিল না। হতভাগিনী যখন কুলীনের হস্ত হইতে উদ্ধার হইলেন, তখন মনে করিয়াছিলাম, বসন্তকুমারীকে আর সতিনের জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। তারপর যখন স্বামীর সহিত প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল, তখন মনে করিয়াছিলাম বসন্তের জীবন তবে বুঝি প্রকৃত সুখের জীবন হইল। কিন্তু হায়, বিধাতা কুলীন রমণীর জন্য বাঙ্গলায় যেন আর সুখ ও শান্তি সৃজন করেন নাই;—যেখানে কুলীন অবলা, সেইখানেই সতিনের বাক্য যন্ত্রণা, সেই খানেই অশান্তি, সেইখানেই অসুখ। রূপবল, গুণবল, ভালবাসা বল কিছুতেই বসন্তকুমারীকে সতিনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। এমনি দুর্ভাগ্য, পূর্ব্বের সতিনই আসিয়া আবার যুটিলেন! ভগবানের ইচ্ছা কে খণ্ডন করিবে?

অবলাকুলের দোষ ঘোষণা করা আমাদের প্রাণের অসহ্য, ইচ্ছা থাকিলেও লেখনী নিশ্চল হয়,—এই স্থানে আসিয়া স্থির হইয়া পড়ে। কিন্তু এক একটী রমণী অসরল প্রেমজাল বিস্তার করিতে এমনি পটু যে আমা-

দের বিশেষ অপ্রিয় হইলেও, লেখনী হইতে অক্লেশে সে কথা বাহির হইয়া পড়ে, কোন রকমেই আর মনের কথা ঢাকা থাকে না। পৃথিবীর কোন কোন কবি এই কারণে রমণীর প্রেমকে গরলময় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও দেখিয়াছি, বাহিরে প্রেমসুধায় রঞ্জিত হইয়া কোন কোন রমণী, পুরুষের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া, তারপর গরল ঢালিয়া দিয়া পুরুষকে অধঃপতিত করেন। দোষ কাহার? কেহ কেহ বলিবেন, পুরুষ যদি না ভুলিত, তবে ত রমণীর কপটতায় কোন অনিষ্ট হইত না,—কুহক মন্ত্রে হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া পড়িত না। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু অভিসন্ধি যাহার, সে কি অধিকতর দোষী নহে? প্রলোভনে জয়ী হইলে মনুষ্যত্ব অটল থাকে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু একজন অভিসন্ধি করিতেছেন, আর একজন অভিসন্ধির জালে জড়িত হইতেছেন; দোষ কাহার অধিক? একজন চক্রান্ত করিয়া অন্য একজনকে হত্যা করিয়া ফেলিল, এস্থলে দোষ কাহার? যে হত্যা করিল তাহার, না যে হত হইল তাহার? যে মরিল, সে কেন আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, এই কথা বলিয়া যাহারা হতব্যক্তিকে দোষী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই;—আমরা বলি, নিরপেক্ষ বিচারে চিরকাল পৃথিবীতে হত্যাকারীই দোষী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে রমণী ছদ্মবেশে প্রেমরূপে পুরুষের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন, সে রমণী যে কলঙ্কিনী, একথাও কি আবার প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে? দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গলায় এই প্রকার কলঙ্কিনীদিগের দ্বারা অনেক হৃদয়বান পুরুষের অন্তর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে;—গৃহে অশান্তির অনল, বাহিরে অশান্তির অনল, সর্ব্বত্র অশান্তি। যে সকল রমণী কলঙ্কের বোঝা মস্তকে লইয়া, লজ্জা শরম ডুবাইয়া দিয়া, রাস্তা ঘাটে শিকার অন্বেষণের জন্য কপট ভালবাসার জাল বিস্তার করিয়া অহরহ কত জনের ধর্ম্মাপহরণ করিয়া জীবনকে কলঙ্কিত করিতেছে, আমরা কেবল সে সকল কলঙ্কিনীদিগের কথা বলিতেছি না,—বাঙ্গলার অগণ্য গৃহ এই প্রকার কলঙ্কিনীদিগের দ্বারা অশান্তির ভবন হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষার অভাবে যে রমণীকুলের এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, সে কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? এবং পুরুষেরাই যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছেন, এ কথার প্রতিবাদ করিতেই বা কে সাহসী হইতে পারেন? যাহারা বলেন যে, ঈশ্বর কেন এই চিত্রকে রূপা-

স্বরিত করিলেন না, আমরা তাহাদের কথার উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা দেখি না। এই চিত্র রূপান্তরিত হইলে তখন আমরা রমণীকুলেরই দোষ ঘোষণা করিতাম। আমরা বলি, বাঙ্গালার পুরুষেরাই এই প্রকার কলঙ্কের জন্য অধিকতর দোষী। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষেরাই একসময়ে ফাঁদ সৃজন করিয়া অন্য সময়ে তাহাতে পা দিয়া পড়িয়া মরিতেছে;—এক সময়ে অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্য সময়ে তাহাতে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতেছে। ঐ রমণী কলঙ্কিনী ঐ পুরুষের চক্রান্তে;—ঐ রমণী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন ঐ পুরুষের চক্রান্তে। আর আজ, পাঠক, ঐ যে সুশীলার ছবি বিচারকের আসনে বসিয়া তুমি দেখিতেছ,—কত কলঙ্ক ইহার জীবনে দেখিয়া রমণীকুলের প্রতি বিরক্ত হইতেছ, ইহার জীবনের কলঙ্কের জন্য তোমরাই দায়ী। শিক্ষায় মানবের মন কেমন উন্নত হয়, একথা কি তোমরা বুঝিতে পার নাই? তবে অবলাদিগকে কোন্ অপরাধে এই রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিতেছ না? শিক্ষায় যে তাহাদের মন উন্নত হইত, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিত, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? শিক্ষার প্রভাবে তোমরা কত স্বার্থ ডুবাইয়া দেশে একতা স্থাপনে যত্ন করিতেছ, আর সতিন রমণীগণ, এক স্বামীর হৃদয়ের ভালবাসার পাত্রী হইয়াও কি অভিন্ন হৃদয়ের সম্মান জগতে অক্ষত রাখিতে পারিত না? শিক্ষিতা হইলে অবশ্য পারিত। আবার দেখ, ঐ যে কৌলিন্য-প্রথা, যাহার জন্য বাঙ্গলার এক বিভাগের শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইতেছে, হায়, ঐ কৌলিন্য-প্রথা না থাকিলে কি সুশীলাকে আজ তোমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিতে? সকলি তোমাদের লীলা, ঐ কৌলিন্য-প্রথা তোমাদেরই কার্য্য, ঐ শিক্ষা বিস্তারের অভাব তোমাদেরই ঔদাসীন্যের পরিচায়ক। তোমরাই সুশীলাকে আজ ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিয়াছ, তোমরাই চক্রান্ত করিয়া ঐ হতভাগিনীর মস্তকে কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া ক্রীড়া করিতেছ, এবং আনন্দে নৃত্য করিতেছ। হায়, যে দেশে পুরুষের জন্য রমণী কাঙ্গালিনী, কলঙ্কিনী, হতভাগিনী, সে দেশের দুর্দ্দশা স্মরণ করিলে কি হৃদয়ে শান্তি থাকে,—না সুখ থাকে, না আনন্দ থাকে? নিমেষের মধ্যে সকল তিরোহিত হয়।

যাহা বলিতেছিলাম, সুশীলা এতদিন পরে কুলীনকুলের গৌরব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুশীলা, পাগলিনী-বেশে, সতিন প্রভাবতীকে যে প্রকারে পথের ভিখারিনী করিয়াছেন, তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন। শিব-

নারায়ণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার চক্রান্তে সুশীলা রাজা গজেন্দ্রনারা-য়ণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলঙ্কিনীর সহিত শিবনারা-য়ণের কি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে আর আমাদের অভিলাষ নাই। রাজা সুশীলাকে গ্রহণ করিবার সময় সমস্ত বিষয় সুশীলার নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে। সুশীলা সেই সূত্র ধরিয়া ক্রমে ক্রমে রাজার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন ;—শিবনারায়ণ বিষয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হইল, কর্ত্রীঠাকুরাণী বিষয়ের ভার নিজ হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের অস্থি-মজ্জা বিভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারী লোকের উৎকৃষ্ট ভূষণ।

অশিক্ষিত লোকের হস্তে ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্য পড়িলে যাহা হয়, শিবনারা-য়ণের তাহাই হইল ;—শিবনারায়ণের বুকেরছাতি ফুলিয়া উঠিল। অহঙ্কারে শিবনারায়ণ সংসারটাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অহঙ্কারের রাজত্ব সর্ব্বত্র। পত্রের আড়ালে নিকুঞ্জ বনে লুক্কায়িত হইয়া সাধক ধর্ম্ম-সাধন করিতেছেন,—বৈরাগ্য সাধন করিতেছেন—সংসারের সুখবিলাসকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছেন, ধীরে ধীরে ঐ সাধকের নিকট গমন কর, দেখিয়া অবাক হইবে,—ঐ বৈরাগী সাধকের মন অহঙ্কারে স্ফীত, সকল পরিত্যাগ করিয়া ঐ সাধক অহঙ্কারের রাজ্যের প্রজা হইয়াছেন, মনে করিতেছেন—'পৃথিবী পিশাচের বিলাসক্ষেত্র, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক সংসারে আর নাই।' আবার দেখ ঐ যে ভোগবিলাসবিরত যুবক গভীর জ্ঞানতত্ত্ব লাভের লালসায় অবিরত পুস্তকের প্রতি অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহি-য়াছেন—পৃথিবী গেলেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না, অর্থকে কৃপণের হৃদয়-রঞ্জন বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয়, যদি মানবতত্ত্ব অধ্যয়নে বাসনা থাকে, তবে উঁহার নিকটে যাও, দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া যাইবে,—জ্ঞানের মহাসমুদ্র তটে বসিয়া বিনয়ের পরিবর্ত্তে ঐ

মহাত্মা কেবল অহঙ্কারকেই শরীরের একমাত্র সারভূষণ করিয়াছেন; উনি যে অন্যদিকে ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না, সে অভিনিবেশের ফল নহে,—কিন্তু অজ্ঞান অশিক্ষিত সংসারের কি ছাই দেখিবেন, ইহা মনে করিয়াই মৌনী হইয়া রহিয়াছেন;—তুমি আমি জগৎসংসার উঁহার নিকট ধূলিকণার ন্যায় অসার এবং অকিঞ্চিৎকর। আর কাহার কথা বলিব? ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া দেখ,—যদি অহঙ্কারকে কোন মানব জয় করিতে পারিয়া থাকে, তবে জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই পারিয়াছে। নিউটন এবং যিশুখৃষ্ট বিনয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন। আজ কাল ধার্ম্মিক এবং জ্ঞানীদিগের যখন এই প্রকার দুর্দ্দশা, তখন আর নিরহঙ্কারী মানবের কথা কোথায় শুনিবে? যে দেশের লোকদিগকে শিক্ষা এবং ধর্ম্ম বিনীত করিতে পরাস্ত হইল, সে দেশে অশিক্ষিত এবং অধার্ম্মিকের জীবন যে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

শিবনারায়ণ নিতান্ত অশিক্ষিত, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, কখনও তাহার তত্ত্বও লয় নাই। শিবনারায়ণ বক্ষ স্ফীত করিয়া উন্নত মস্তকে পৃথিবীকে তৃণের ন্যায় দেখিতে লাগিল। পৃথিবী?—পৃথিবী যেন তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতেছে,—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত মান সম্ভ্রম, সমস্ত জ্ঞান গৌরব, বিদ্যা বুদ্ধি তাহার চরণে আবদ্ধ। শিবনারায়ণকে বুদ্ধিমান বলিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে, কারণ শিবনারায়ণের বুদ্ধি না থাকিলে কখনওসে সুশীলার দ্বারা রাজা গজেন্দ্রনারায়ণকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইত না। ম্যানেজার হইবার পর ৬ মাস যাইতে না যাইতে শিবনারায়ণ সমস্ত বিষয়াদির কর্ত্তা হইয়া উঠিল, রাজাকে পর্য্যাপ্ত উপেক্ষা ও তাচ্ছল্য করিতে আরম্ভ করিল;—রাজা কোন আদেশ করিলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা অবহেলা করে, কোন কার্য্যের ভার দিলে তাহা প্রাণান্তেও করে না। ক্রমে ক্রমে এমন হইয়া উঠিল যে, সামান্য খরচ পত্রের জন্য রাজা গজেন্দ্রনারায়ণকে সুশীলা এবং শিবনারায়ণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। এ ভালবাসা কি মানবের না হইলেই চলে না? মান গেল, সম্ভ্রম গেল, ঐশ্বর্য্য গেল প্রাণের সহধর্ম্মিণীকে এবং পুত্রকে বিসর্জ্জন দিতে হইল, তবুও কি এ ভালবাসার মমতা পরিত্যাগ করা যায় না? যাঁহারা একবার কুহকমন্ত্রে নতশির হইয়া ভালবাসার রাজ্যে ঘর বাঁধিয়া প্রজা হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর নিস্তার নাই। বৃদ্ধই হউন, যুবকই হউন, আর বালকই হউন, হৃদয়ের

মধ্যে যিনি একবার এই ভালবাসাকে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাকেই চির জীবনের তরে দাসখৎ লিখিয়া দিতে হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বস্ব যাইতে লাগিল, তবুও তাহার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল না,— তবুও তিনি দাসত্বব্রত পরিহার করিয়া স্বাধীন হইতে পারিলেন না। যে স্থানের আকর্ষণে বৃদ্ধ পক্ককেশে পমেটম দিয়া টেরি কাটে,—যে স্থানের মমতায় কালপেড়ে ধুতি দ্বারা অঙ্গ শোভিত করে,—পুত্র কন্যার কথা ভুলিয়া বিলাসের সেবায় রত হয়, সে স্থানকে বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া কে অপদার্থ জীব-শ্রেণীতে নাম লিখিতে পারে? গজেন্দ্রনারায়ণের সর্ব্বস্ব গেলেও ঐ চরণ ভুলিতে পারেন না।

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ নব শোভায় ভূষিত হইয়া গগণে আপন মস্তক উত্তোলন করিল;—শিবনারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ দ্বারা আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফেলিল। পৃথিবীতে ধন নাকি চিরকাল একজনের ভাণ্ডারে থাকে না,—তাই গজেন্দ্রনারায়ণের ধন ঐশ্বর্য্য শিবনারায়ণের কোষ পূর্ণ করিতে চলিল,—গজেন্দ্রনারায়ণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শিবনারায়ণের মায়ায় জড়িত হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে গরিব দুঃখী যে, সে কি কখনও অর্থের মুখ দেখিবে না?—বংশক্রমে চিরকালই কি একস্থানে অর্থ রাশিকৃত হইয়া এক শ্রেণীর সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে রত থাকিবে? যদি তাই হবে, তবে গরিব দুঃখীর পক্ষে পৃথিবী না থাকিলেই ভাল হইত। কিন্তু বিধির বিধান স্বতন্ত্র। মানব সমাজের ইতিহাস অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলে দেখা যায়, অর্থ চিরকাল একস্থানে থাকে না,—লক্ষ্মীর চিরদিন একস্থানে বসতি করা হয় না। অলক্ষ্মী আসিয়া মানবের ঘাড়ে চাপিয়া লক্ষ্মীর চিরপ্রথা অপ্রতিহত রাখিতে চেষ্টা করিতে থাকে। লক্ষ্মীর আদেশানুসারেই যেন লোক কুপথে গমন করিয়া লক্ষ্মীর বিদায়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই কারণেই গজেন্দ্রনারায়ণ বুঝিয়াও যেন কিছুই বুঝিতেছেন না, দেখিয়াও যেন কিছু দেখিতেছেন না;—তাহার গৃহলক্ষ্মী উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবনারায়ণের গৃহে আসন গ্রহণ করিলেন। শিবনারায়ণ জীবনে অধর্ম্ম ক্রয় করিল বটে, কিন্তু সংসারের চক্ষে ক্রমে ক্রমে সে মহৎ লোক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল;—লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া হাটিয়া আসিয়া তাহার গৃহে আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অহঙ্কার যখন জীবনের ভূষণ হইল, ঐশ্বর্য্য যখন গৃহদেবতা হইল, তখন শিবনারায়ণ একজন প্রকৃত

বড়লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক হইতে শত শত লোক তোষামোদের স্তুতিপাত্র হাতে লইয়া শিবনারায়ণের মনস্তুষ্টির জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারীর পরিণাম।

কপট ভালবাসার আবরণে আবৃত হইয়া সুশীলা গজেন্দ্রনারায়ণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। শিবনারায়ণ যখন বিষয় ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কর্ত্তা হইয়া উঠিল, তখন সুশীলা স্বামীর মন তুষ্টার্থে বলিলেন,—'তুমি আমি উভয়ে ক্রীড়ালয়ে আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকিব, তোমার প্রজাশাসন ইত্যাদিতে প্রয়োজন কি, আমি কি আর মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারি।' আসক্তিমগ্ন গজেন্দ্রনারায়ণ এই সকল কথাতে এক প্রকার সন্তুষ্ট হইলেন, না হইয়াই বা কি করেন, কোন প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন গজেন্দ্রনারায়ণ বাড়ীর ভিতরে আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন, তাঁহার জন্য যে পাত্রে আহারীয় দ্রব্যাদি ছিল, সেই পাত্র হইতে একখানি মৎস্য খাইয়া একটা বিড়াল সেই স্থানে ছট্ ফট্ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। এই ব্যাপারটী দেখিয়া গজেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; সে দিন আর বাড়ীর ভিতরে কিছুই আহার করিলেন না। পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন; বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ভিতরের সমস্ত কথা রাজাকে বলিয়া দিল, এবং বলিল এক দিন হঠাৎ আপনি বাড়ীর ভিতরে আসিবেন, তবেই আমার কথা সত্য কি না, বুঝিতে পারিবেন। রাজা মনের ভাব অতি গোপনে রাখিয়া আবার রীতিমত বাড়ীর ভিতরে সতর্কতার সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিলেন,—মনের সন্দেহের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিলেন না। কিয়দ্দিবস পরে একদিন হঠাৎ দুপ্রহরের সময় বাড়ীর ভিতরে আসিয়া একেবারে সুশীলার ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় একজন প্রহরী

রাজাকে অবরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা বলপূর্ব্বক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শিবনারায়ণ ও সুশীলা উভয়ে বসিয়া খোসগল্প করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহার সর্ব্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। সেই সময়ে রাজার হস্তে কোন প্রকার শাণিত অস্ত্র থাকিলে এই ঘটনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা ছিল না; রাজা আর অধিক সময় অপেক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

রাজা বাহিরে আসিলে সুশীলার মুখ মলিন দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিল, তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই, আমি সত্বরই ইহার প্রতিশোধ তুলিতেছি; এই বলিয়া শিবনারায়ণ তখনই গৃহের বাহিরে আসিল, এবং অবিলম্বে একখানি নৌকায় উঠিয়া স্থানান্তরে চলিল। এই দিন হইতে রাজার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কেন মত্ত হইয়া প্রভাবতীকে পরিত্যাগ করিলাম,—কেন তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলাম, এই সমস্ত চিন্তা উদিত হইয়া রাজার মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল;—প্রাণের সরোজকুমারের শোকোচ্ছ্বাস রাজাকে অবসন্ন করিয়া তুলিল, অনুতাপে ও আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রাজা কয়েক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। সুশীলা বিবিধ উপায়ে রাজার মনকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; নানা প্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রবঞ্চনা করিয়া রাজার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন,—ভালবাসার কত কুহক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—মাথা কুটিয়া, কপাল ভাঙ্গিয়া, কাঁদিয়া আপনার ভালবাসার পরিচয় দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজা ভুলিলেন না। রাজা মধ্যে মধ্যে,—পাপীয়সি, দূর হ, তোকে যেন আর এজন্মে না দেখ্‌তে হয়, এই প্রকার নির্দ্দয় কঠোর বাক্যে সুশীলাকে ভর্ৎসনা করিতেন। সুশীলা ম্রিয়মাণ হইয়া বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন; রাজার তীক্ষ্ণ কটাক্ষে সুশীলার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল,—আপনার কার্য্যের জন্য হৃদয়ে দুঃখ হইতে লাগিল।

এদিকে শিবনারায়ণ একেবারে শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। ইতিপূর্ব্বেই রাজ্ঞীর প্রতি গজেন্দ্রনারায়ণের কঠোর ব্যবহারে প্রজারা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, রাজার নির্দ্দয় ব্যবহারে এবং শিবালয়ের নানা প্রকার অত্যাচারে চারি পাঁচ মাস

যাবত তাহারা খাজনা বন্ধ করিয়াছে। প্রথমতঃ নবরাজ্ঞীর জন্য শিবনারায়ণ যে নজরের টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়াছিল, তাহা শিবালয়ের অনেক প্রজাই দেয় নাই;—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রভাবতীর অত্যন্ত পক্ষপাতী। দ্বিতীয়তঃ শিবনারায়ণ জমির খাজনা বৃদ্ধি করায় প্রজারা অনেকে মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়তঃ মাতৃসদৃশা প্রভাবতীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, সুবিধা পাইলেই রাজাকে, দুর্ব্বৃত্ত শিবনারায়ণকে এবং অবশেষে নবরাজ্ঞীকে হত্যা করিয়া মনের যাতনা মিটাইবে। প্রভাবতী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারেন নাই। এই সময়ে শিবনারায়ণ হঠাৎ যাইয়া তাহাদিগের সহিত যোগদান করিল। শিবনারায়ণ বলিল,—"তোমাদের খাজনাদি সম্বন্ধে আমার কোন হাত নাই, রাজাই সকলের মূল, বিশেষতঃ রাজাই পূর্ব্বরাজ্ঞীর সর্ব্বনাশের কারণ, ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার না হইলে আর তোমাদের নিস্তার নাই। আমি পূর্ব্বে রাজাকে চিনিতে পারি নাই, এক্ষণ ভালরকম চিনেছি; আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, সত্বরই তোমরা হত্যার আয়োজন কর।" প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ শিবনারায়ণের কথা বিশ্বাস করিল না, তাহারা শিবনারায়ণকে প্রবঞ্চক মনে করিল। কেহ কেহ ভাবিল, রাজার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া শিবনারায়ণ আসিয়াছে, এই সময়ে ইহার সাহায্যে মনোরথ অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারিবে। এই প্রকার ভাবিয়া তাহারা শিবনারায়ণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাকে আনিবার জন্য, শিবালয়ের গোমস্তাকে রাজবাড়ীতে প্রেরণ করিল। গোমস্তা যাইয়া রাজাকে বলিল,—"যদি আপনি একবার শিবালয়ে উপস্থিত হন, তবে প্রজারা সমস্ত বাকী খাজনাদি দিয়া যোট ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়াছে।" রাজা গোমস্তার মুখে সবিশেষ শুনিয়া অবিলম্বে শিবালয়ে উপস্থিত হইলেন।

শিবালয়ের আর পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য নাই, রাজার বিলাসভবন শ্মশানের ন্যায় হইয়াছে। রাজার বল সামর্থ্য, সুখ সৌন্দর্য্য, সকলি প্রজার হস্তে, প্রজাই রাজশক্তি, প্রজাই রাজার সৌন্দর্য্য। শিবালয়ের প্রজারা আর রাজশক্তির পরিচয় দেয় না,—কলঙ্কিত রাজার সৌন্দর্য্য বা গৌরবের পরিচয় দেয় না,—তাহারা আজ রাজবিদ্রোহী। রাজা সমস্ত দিবস সেই শ্মশানের ন্যায় বিলাসভবনে অবস্থিতি করিলেন,—প্রতি মুহূর্ত্তে সরোজকুমারের স্মৃতি হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল,—প্রতি মুহূর্ত্তে প্রভাবতীর সরল মূর্ত্তি হৃদয়ে

অঙ্কিত হইতে লাগিল। সেই ভবনের সমস্ত গৃহ যেন সরোজের প্রেতাত্মার দ্বারা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। রাজা এক একবার কম্পিত হইতে লাগিলেন, এক একবার অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন,—এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবসের মধ্যে মাত্র কয়েকজন প্রজা রাজদরবারে আগমন করিল, কিন্তু কেহই রাজাকে কোন প্রকার নজর কিম্বা ভেট দিল না। তাহাদিগের ব্যবহারে রাজার প্রাণ আরো অস্থির হইল। যাইবার সময় প্রজারা ঘৃণাসূচক কথা বলিয়া রাজাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, কেহ বা প্রভাবতীর জীবনের সহিত তুলনা করিয়া রাজাকে নরকের কীটের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। রাজার হৃদয় ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। শিবনারায়ণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল,—"প্রজারা অনেকেই টাকা যোগাড় করিতেছে বলিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে না, রজনীতে সকলেই সাক্ষাৎ করিতে আসিবে।" রাজা বিষাদে, এবং দুশ্চিন্তায় অতিকষ্টে সেদিন অতিবাহিত করিলেন।

প্রায় এক প্রহর রজনীর সময় অনেকগুলি প্রজা একত্রিত হইয়া শিবনারায়ণকে বলিল,—"পশ্চিম পাড়ার তসিলে রাজাকে লইয়া চলুন।" শিবনারায়ণের কোন ভয় ভাবনা নাই, মনে ভাবিল, পথের মধ্যে রাজাকে হত্যা করিবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। পশ্চিম পাড়ার তসিল শিবালয় হইতে চারি দণ্ড ব্যবধান,—একটী ক্ষুদ্র খাল দিয়া যাইতে হয়। শিবনারায়ণের চক্রান্ত রাজা কিছুই জানেন না, কিন্তু তবুও তাহার মনে কেমন কেমন ভাব হইতেছে। তিনি প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন, পরে মনে ভাবিলেন,—ভয় কি, সঙ্গে লোকজন রহিয়াছে, কে কি করিবে? ইহা ভাবিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, প্রজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে, ছোট একখানি নৌকায় চারিজন সর্দ্দার লইয়া, শিবনারায়ণের পরামর্শে, তিনি পশ্চিম পাড়ার তসিলের খাল দিয়া যাইতে সম্মত হইলেন। শিবনারায়ণ ভিন্ন নৌকায় অগ্রে অগ্রে চলিল, গজেন্দ্রনারায়ণের নৌকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

শিবনারায়ণের নৌকা নির্ভয়ে যাইতেছিল,—প্রায় দুই দণ্ড ব্যবধানে যাইতে না যাইতে কুড়ি পঁচিশ জন লাঠিয়াল প্রজা আসিয়া শিবনারায়ণের নৌকা আক্রমণ করিল। শিবনারায়ণ ডাকিয়া বলিল,—রাজার নৌকা এ নহে,

পশ্চাতে। কিন্তু লাঠিয়ালেরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে শিবনারায়ণের নৌকায় উঠিল। শিবনারায়ণ তখনও, তাহাদিগের যে ভ্রম হইয়াছে,তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একজন প্রজা বলিয়া উঠিল—'আজ দুজনকেই শেষ করিয়া সরোজকুমারের প্রতিশোধ তুলিব,—মা প্রভাবতীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের শোধ তুলিব। খাজানা বৃদ্ধির কথা, সকল অত্যাচারের কথা কি আমরা ভুলেছি?—আজ তোকে আগে হত্যা করে, সেই রক্ত মাখান অস্ত্র রাজার শরীরে বিদ্ধ করিব।' এই বলিয়া হস্তের শাণিত শূল্‌ফি বলপূর্ব্বক শিবনারায়ণের শরীরে বিদ্ধ করিল, এবং ক্রমে আর আর সকলে অগ্রসর হইয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল। আর নিস্তার নাই বুঝিয়া শিবনারায়ণ অনেক প্রকার কাতরোক্তি করিতে লাগিল,—বলিল "আজ আমাকে রক্ষা কর, তোদের সমস্ত খাজনা মাপ করিব;—প্রভাবতীকে আবার রাজরাণী করিবার চেষ্টা করিব;—তোদের সকল অত্যাচারের স্রোত ফিরাইয়া দিব; তোদের ইষ্টদেবতার দোহাই,আমাকে আজ ছেড়ে দে,প্রাণে মারিস্ নে।" একজন লাঠিয়াল প্রজা বলিয়া উঠিল,—বিপদের সময় অনেকেই এপ্রকার ব'লে থাকে, এখন ক্ষান্ত হ। একজন বলিল, নায়েবজির কথা শোন্, যদি আমাদের প্রতি আবার অত্যাচার করে, তবে তখন প্রতিশোধ তুলিব। একজন বলিল,—আজ ছেড়ে দিলে কাল ভিটার মাটি পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, লাঞ্ছনার একশেষ হবে, আজ কখনই ছেড়ে দেওয়া হবে না; এই বলিয়া পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহাতে যোগ দান করিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শিবনারায়ণের অহঙ্কৃত আত্মা মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। শিবনারায়ণকে শেষ করিয়া লাঠিয়ালশ্রেণী পশ্চাতে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের নৌকার পানে ধাবিত হইল।

রাজার নৌকার সর্দ্দারেরা এবং মাজীরা পূর্ব্বেই নায়েবের নৌকা আক্রমণের গোলমাল শুনিয়া নৌকা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল; রাজা প্রাণ বাঁচাইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া ভয়ে হতচেতন হইয়া নৌকার ভিতরে পড়িয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চক্ষের জলে।

প্রজাবিদ্রোহ লোকের নিকট বড়ই অপ্রিয়কর। আমরা যখন দীন দুঃখী প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহী হইতে দেখি, তখন তাহাদিগের অতীত এবং ভাবী দুর্দ্দশার কথা আমাদের স্মৃতিকে অধিকার করে,এ দৃশ্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, আমবা চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারি না। হতভাগ্য বাঙ্গলার প্রজাদিগের, দুঃখীদিগের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাও,দেখিবে,তাহারা তোমার গোলাম হইয়া যাইবে,—সংসারের স্পৃহাশূন্য,আড়ম্বরশূন্য,প্রতিপত্তিশূন্য, আশাভরসাশূন্য দীন দুঃখী তোমার পদরেণু মস্তকে লইয়া উল্লাসে নৃত্য কবিতে থাকিবে। আর অত্যাচার কর,ঐ হতভাগ্যদের তাহাও সহ্য হইবে! সংসার-তরীর গুনটানা মাঝীর ন্যায় তাহারা সকল প্রকার উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। কিন্তু চিরদিন একভাবে পৃথিবীতে কে কষ্ট সহ্য করিতে পারে? চিরকাল কে অত্যাচার সহ্য করিতে পারে? আড়ম্বরশূন্য নিরীহ জীব পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে, যখন আর সহ্য হয় না, তখন ক্ষমতা বা শক্তির বিষয় না ভাবিয়া একেবারে তাহারা মত্ত হইয়া উঠে। তাহার ফল কি হয়? রাজবিদ্রোহী প্রজার পূর্ব্বে যেমন অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, পরেও তাহাই অদৃষ্টে ঘটে!—শক্তিতে, অর্থেতে কুলায় না; তাহারা অবশেষে অত্যাচারে আত্মসমর্পণ করিয়া, বহ্নিতে স্বেচ্ছাপতিত পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিয়া যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। বিদ্রোহের পূর্ব্বে অত্যাচার, পরেও অত্যাচার। অত্যাচার ভিন্ন কখনও দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের শীতল রক্ত উষ্ণ হয় না, আবার বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়া গেলে, পরিণামে ঐ অত্যাচার ভিন্ন তাহাদের ভাগ্যে আর কিছুই ঘটে না। প্রজাবিদ্রোহ লোকের নিকট যতই অপ্রিয় হউক না কেন, আমরা ইহার মূলে এবং পরিণামে কেবল রাজ-অত্যাচার নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখে বিষণ্ণ হই।

সেই রজনীতে বিদ্রোহী প্রজারা রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের নৌকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পথিমধ্যে হঠাৎ একটী জীর্ণ, শীর্ণ, মলিনবেশধারিণী

মানবীর সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগের হস্তপদাদি সে মূর্ত্তি দেখিয়া অবশ হইয়া আসিল,—হস্তের অস্ত্রাদি মৃত্তিকায় রাখিয়া একে একে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, এবং জানুর উপর সকলে বসিয়া কর-যোড়ে বিনীত স্বরে বলিল ;—"মা, আপনার প্রসাদে আজ আমাদের মনো-রথ প্রায় পূর্ণ করেছি,— আর ক্ষণকাল পরে আপনাকে লইয়া আমরা নৃত্য করিব।" এই কথার পর শুষ্ক কণ্ঠ হইতে ক্ষীণস্বর নির্গত হইল,—"বাছা, তোমরা ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, তোমাদের কল্যাণ দিবানিশি জগদী-শ্বরীর নিকট কামনা করিতেছি ; কিন্তু তোমরা আর অপরাধ করিও না, ভগবতীর চক্ষে এ সকল সয় না ; তোমরা আজ যাহা করেছ, তাহা মনে হলে আমার কেবলি অশ্রুপাত করিতে ইচ্ছা হয়। তোমাদের হস্ত মানবের শোণিতপাতে কলুষিত হইল, ইহা আমি কি প্রকারে সহ্য করব ?" এই বলিয়া সেই দেব-কন্যা অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ; তাঁহার ক্ষীণস্বর প্রত্যেক প্রজার অন্তরে যেন শেল বিদ্ধ করিল। তাহারা পুনঃ বলিল ;—"মা, মনুষ্যের শরীরে কত সয় ? আমাদিগের সকলি ত আপনি জানেন ; আপনার প্রসাদে কত সহ্য করেছি, নচেৎ এতদিন রাজভবনকে শ্মশান করিয়া দিতাম,—রাজার রক্তে আমাদের সকল অত্যাচারকে ডুবাইয়া দিতাম। আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য অনেক সহ্য করেছি, জননি, আজ ক্ষমা করুন, আজ মনের সাধ মিটাইয়া,—ঐ রাজার মস্তক ছিন্ন করিয়া, পরে আপনার চরণ পূজা করিব ; আর পারি না, আর অত্যাচার সহ্য হয় না।"

জননী পুনঃ অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে আমি তোমাদিগকে অনুমতি দিতে পারি না,—আমাকে অগ্রে এই স্থানে দ্বিখণ্ড করিয়া তারপর তোমরা রাজার নৌকার দিকে যাও, সতীর রক্ত স্বামীর রক্তে মিশাইয়া তোমারা অক্ষয়কীর্ত্তি রাখ। তোমরা কি জান না, আমি দিন রাত্রি কেবল স্বামীর কল্যাণ কামনা করিতেছি ? আমি জীবিত থাকিতে, আমার জ্ঞাতসারে সেই স্বামীর অঙ্গে আঘাত করিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না ;—আগে তোমাদের অস্ত্রে আমাকে বধ করিয়া উপযুক্ত সময়ে তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিও।" এই প্রকার নিদারুণ কথা শুনিয়া প্রজাদিগের হৃদয় ভেদ করিয়া যেন শোকোচ্ছাস বাহির হইতে লাগিল,—সকলে একসময়ে ক্রন্দনস্বরে বলিয়া উঠিল ;—"মা ! সরোজকুমারের কথা কি আপনি ভুলিয়াছেন ? রাজ-ভবনের সুখ ঐশ্বর্য্য কি আপনি ভুলিয়াছেন ?"

জননী পুনঃ বলিলেন,—"মা ভগবতীর প্রসাদে সকলি ভুলেছি। আমার সরোজকে আবার আমার ক্রোড়ে পাইয়াছি! আমি দিন রাত্রি যে ঐ শ্মশানে পড়ে থাকি, সে কাহার মায়ায়? ঐ শ্মশানে গেলেই আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, ঐ শ্মশানে বসিলেই প্রাণ শীতল হয়। কেন হয়? ঐ শ্মশানে বসিলেই কে যেন আমার সরোজকুমারকে আনিয়া দেয়! আমি আর কিছুই দেখি না, চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া যায়, কেবল বাছার মূর্ত্তি দেখিতে পাই;—আর কি দেখি? দেখি, আমার পার্শ্বে কাঁপিতে কাঁপিতে যেন রাজা আসিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন! তোমরা বল, আজও রাজা অত্যাচার করেন, তোমরা বল, আজও রাজা আমাকে দেখিতে পারেন না,—আমি তাহা স্বীকার করি না। ঐ মূর্ত্তি,—ঐ গম্ভীর শান্ত ও বিনীত মূর্ত্তি কি কখনও অত্যাচার করিতে পারে? ঐ শ্মশানে আমি রাজার যে মূর্ত্তি দেখি, সে মূর্ত্তি কখনও অত্যাচার করিতে পারে না। তোমাদিগকেও অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ কখনও তোমাদিগকে মিথ্যাচরণ করিতে দেখি নাই; তবে কি আমি প্রতারিত হইয়া থাকি? তা মা ভগবতীই জানেন। আমি জানিয়া কি করিব? আমি ত সব ভুলেছি, তোমরাও ভুলিয়া যাও, এই কামনা করি। আর যদি ভুলিতে না চাও, তবে আমার মস্তক অগ্রে দ্বিখণ্ড কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে জননীর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল, সর্ব্বশরীর যেন কম্পিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তিনি চেতনাশূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

জননীর এতাদৃশ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া প্রজাদিগের হৃদয়-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইল, হস্তপদাদি অবশ হইয়া উঠিল; তাহারা ধীরে ধীরে ধরাধরি করিয়া জননীকে শ্মশানে লইয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যোগবলে।

জননী প্রভাবতীর কি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমদুঃখী পাঠক, তোমাকে বলিতেছি। পাগলিনীর উত্তেজনায় রাজা যখন শিবালয়ের ভবন

হইতে অনাথিনীর বেশে প্রভাবতীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তখন প্রভার আর দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশান্তরে যাইয়া অবশিষ্ট দিন ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া অতিবাহিত করিবেন; কিন্তু প্রাণসম সরোজকুমারের শ্মশানের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। দিবসে রাজকর্ম্মচারীর ভয়ে প্রভাবতী কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতেন, রজনীযোগে সরোজের শ্মশানে একাকিনী দুঃসময় অতিবাহিত করিতেন। ক্রমে ক্রমে প্রভার আহার নিদ্রার আসক্তি চলিয়া যাইতে লাগিল, যদি কেহ কিছু প্রদান করিত, তবে আহার করিতেন। ক্রমে ক্রমে কোমল স্বভাবের গুণে সমস্ত অধিবাসী প্রভার ভালবাসার আকর্ষণে জড়িত হইয়া পড়িতে লাগিল;—ক্রমে প্রজারা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দুঃখিনী প্রভাবতী যখন এই সকল বুঝিতে পারিলেন, তখন প্রজাদিগকে বুঝাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহারা অন্যায় অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া প্রভাবতীর আদিষ্ট পথে চলিতে স্বীকৃত হইল না।

গভীর নিশীথসময়ে শ্মশানে অবস্থিতি করিতে করিতে প্রভাবতীর মনে ক্রমে উদাস উদাস ভাব উপস্থিত হইতে লাগিল,—হৃদয়ের মধ্যে একপ্রকার অভাব বোধ হইতে লাগিল। এই প্রকার উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তিনি এক রজনীতে আকাশের পানে তাকাইয়া কি যেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে পদশব্দ শ্রুত হইল। প্রভাবতী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন,—একজন বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। প্রেতভূমিতে গভীর রজনীতে দ্বিতীয় লোকের সমাগম, এই চিন্তা উভয়ের মধ্যে,উভয়ে উভয়ের পানে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। প্রভাবতীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ক্ষীণ শরীর অল্প অল্প কম্পিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? প্রভাবতী উত্তর করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ পুনঃ বলিলেন,—তোমার কোন ভয় নাই,আমি নরহন্তা নহি,নির্ভয়ে পরিচয় দেও।

প্রভাবতী অতি কষ্টে বলিলেন,—আমি ভদ্রেশ্বরের রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের—। আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধ পুনঃ বলিলেন,— বুঝিয়াছি, তুমি নরপিশাচের ক্রীড়ারসামগ্রী ছিলে। কিন্তু আজ এবেশে এখানে কেন?

প্রভাবতী বলিলেন,—আমার প্রাণের সরোজকুমারের মমতায় এই শ্মশানের আশ্রয় লইয়াছি। এই কথা বলিয়া অতিকষ্টে চক্ষেরজলে ভাসিতে ভাসিতে

প্রভাবতী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—"মা, তোমার কোন ভয় নাই; আমি তোমাকে এমন পথ দেখাইয়া দিতেছি, যে পথে গমন করিলে তোমার স্বামী পুত্র সমস্ত পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া প্রভাবতীর কাণে ২ কয়েকটী কথা কহিয়া পুনঃ বলিলেন, এই ভাবে উপবেশন করিয়া এই কয়েকটী কথা কেবল জপ করিবে।' এই বলিয়া বৃদ্ধ আপনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং প্রভাবতীর হস্ত স্পর্শ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত হইল, উষার প্রাক্কালে বৃদ্ধ আবার বলিলেন,—"এই শ্মশানে বসিয়া প্রত্যহ এইভাবে যোগসাধন করিবে। যোগসাধন হইলে, অতি অল্পকালের মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় সংসার তোমার হইবে, তাঁহার প্রসাদে তাঁহার প্রিয় মনুষ্যসন্তান তোমার হইবে,—স্বামী ও পুত্রকে তুমি প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ গমনোদ্যত হইলেন। প্রভাবতী দেখিলেন বৃদ্ধের হস্তে নরমুণ্ডের কঙ্কালের ন্যায় কি একটা পাত্র রহিয়াছে, ভয়ে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ পাত্র দ্বারা আপনি কি করেন? আমাকেও কি উহা গ্রহণ করিতে হইবে?

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিলেন—"উপদেশ চাহিতেছ? আমার নিকট এক্ষণ তাহা পাইবে না। আমি যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলিব, তাহাই শুনিবে, উপদেশ চাহিবে না। যে মন্ত্র তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, উহা জপ করিলে সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবে। মন্ত্রের কথা প্রাণান্তেও কাহাকে বলিবে না। কাহারও নিকট কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা উপদেশ প্রার্থনা করিবে না, ভগবান তোমার একমাত্র উপদেষ্টা, তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিবে। এ রাজ্যের সাহায্য সম্বন্ধে মানবজগৎকে ভুলিয়া যাইবে,—কেবল তুমি ও তোমার ইষ্টদেবতা জনপ্রাণীহীন অকূল সাগরে ভাসিতেছ, মনে করিবে। এ রাজ্যে বসতি করিলে মানবের সকল অভাব পূর্ণ হয়,—আপনা আপনি লোক জ্ঞানমার্গে অধিরোহণে সমর্থ হয়।"

প্রভাবতী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নাম কি, আপনার সহিত কি আর সাক্ষাৎ হইবে না?

বৃদ্ধ পুনঃ বলিলেন,—পরিচয় কেন চাহিতেছ?—আমার কথা যদি পূর্ণ না হয়, তবে তাহা পালন করিও না, নামের সহিত যোগশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। গুরুপূজা করা পৃথিবীর একটা রোগ হইয়া উঠিয়াছে; আমার নাম জানিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। আমার সহিত আর তোমার

সাক্ষাৎ হইবে কিনা জানি না,—মনুষ্যজগৎ আপন ইচ্ছায় পরিচালিত হইতে পারে না;—ভগবানের ইচ্ছায় কখন কোথায় যাইব, কিছুই জানি না; আমরা সকলে ভগবানের হস্তের ক্রীড়ার পুত্তলিকাবিশেষ;—তিনি যাহা করান, আমরা তাহাই করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া প্রভাবতী শিহরিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন,—ভগবান যাহা করান, তাহাই মনুষ্য করে, তবে কি পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের বিচার নাই? হৃদয়ের মধ্যে এই প্রকার ভাবান্তর হইল বটে, কিন্তু বৃদ্ধের নিকট আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না; কারণ বুঝিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাই-বেন না। তিনি নীরব হইলেন, বৃদ্ধ আস্তে আস্তে পদসঞ্চালন করিয়া এক-দিকে চলিতে লাগিলেন,—ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের রশ্মিতে ডুবিয়া অদৃশ্য হইলেন।

প্রভাবতী সেই দিন হইতে সেই যোগমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার জীবন ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রভাবতী শাস্ত্র জানেন না, তন্ত্র জানেন না, পুরাণ জানেন না, সেই বৃদ্ধের আদিষ্ট মন্ত্রই শাস্ত্র, তন্ত্র, পুরাণের কার্য্য করিল। সমস্ত রজনী যোগধ্যানে অতিবাহিত করিতে করিতে ক্রমে সরোজকুমারের শোকাগ্নি যেন নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে লাগিল, রাজার বিচ্ছেদযন্ত্রণা যেন শিথিল হইতে লাগিল। যে সকল জটিল প্রশ্ন একদিন মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সহজে সে সকলের মীমাংসা হইয়া যাইতে লাগিল; গভীর যোগশাস্ত্র তাঁহার জীবনের আয়ত্ত হইয়া উঠিল,—ভগবানের ইচ্ছায় প্রভাবতী সংসারে নির্ব্বান হইলেন,—তাঁহার সংসারের আসক্তি নিবিয়া গেল। ধ্যানে বসিলে দেখিতেন ইষ্টদেবতার সহিত স্বামীপুত্র একত্রে তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছেন। এই প্রকারে প্রভার জীবনের অভাব পূর্ণ হইতে লাগিল। প্রভার ধর্ম্ম জীবনের সহিত ক্রমে ক্রমে সেই শিবালয়ের প্রজাসমূহ আরো ঘনিষ্ট সূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল।

সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ভগবান তাঁহার সহায়, একথার অর্থ আমরা সময়ে সময়ে বুঝিতে পারি না। পৃথিবীতে দেখিয়াছি, যাঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, পৃথিবীর চক্ষে তাঁহারা যে জীবনে কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও কষ্ট হয়। তাঁহাদের ইচ্ছা কি সাধু ছিল না? তবে ভগবান কেন সহায় হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন নাই? মানব যখন সাধুইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, সংসারের কোন বিপদই

তখন তাঁহার নিকট বিপদ বলিয়া বোধ হয় না, বিপদ তাঁহার নিকট সম্পদ হইয়া যায়,—পৃথিবী যাহাকে কষ্টযন্ত্রণা বলে, তাহা তাঁহার নিকট সুখের বস্তু হয়। এই যে ভাব ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কি সকল সময়ে মানব আপন ইচ্ছায় উপার্জ্জন করিতে পারে? ধার্ম্মিকদিগকে যে স্থানে অটল দেখিয়া আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি না, আপন ক্ষমতায় কেহ কি সেই স্থানে অটল থাকিতে পারে? বিশ্বাসীর ঈশ্বর, বিশ্বাসীর ভগবান সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ভক্তকে অটল রাখেন।—তুমি আমি যে স্থানের কথা মনে করিয়া কম্পিত হই, তাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভীক হৃদয়ে বীরের ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকেন,—পৃথিবীর নির্যাতন, অত্যাচার তাঁহাদের নিকট কোমল পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় মনে হয়। মহাত্মা যিশুখৃষ্টের ভগবান যদি তাহার সহায় না থাকিতেন, তবে খৃষ্ট কি অম্লানবদনে আপন ধর্ম্মরক্ষার জন্য ক্রুশকাষ্টে বিদ্ধ হইয়া জীবনপাত করিতে পারিতেন? ভগবান যদি মনোরাজ্যে প্রলোভনের সুন্দর বস্তু সৃজন করিয়া শাক্যকে না ভুলাইয়া রাখিতেন, তবে শাক্যসিংহ কি কখনও রাজ্যসুখ তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিতে পারিতেন? সংসারের চক্ষে যাহা বিপদ, সাধকের পক্ষে তাহা সম্পদ,—সংসারের চক্ষে যাহা সুখ, সাধকের চক্ষে তাহা বিষ। ভগবানের প্রলোভনের তুলনায় সংসারের প্রলোভন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমরা সংসারের চক্ষে অনেক সময়ে ধার্ম্মিকদিগকে অনেক প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে দেখি বটে, কিন্তু সে সকল তোমার, আমার নিকটই সুখের বস্তু, ধার্ম্মিকদিগের নিকট তাহা কিছুই নহে। ভগবান তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যপূর্ণ জগৎ সংস্থাপন করিয়া রাখেন, তাহার নিকট সংসারের সকল প্রকার শোভা সৌন্দর্য্য নিতান্ত কদর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই মনুষ্যজাতির সাধকেরা বলিয়া থাকেন,—সাধু যাঁহার ইচ্ছা ভগবান তাঁহার সহায়। ভগবান ক্রোড়ে লইয়া শিশু ধ্রুবকে, শিশু প্রহ্লাদকে যেমন রক্ষা করিয়াছেন, সেই প্রকার সাধু খৃষ্টকে, ম্যাট্‌সিনিকে রক্ষা করিয়াছেন। আর প্রভাবতীর চিত্র আমরা জগৎসংসারকে দেখাইতে বসিয়াছি,—'এই লেখক ধার্ম্মিকদিগকে কেবলই কষ্টে নিপতিত করিয়া ক্রীড়া দেখে,' এই কথা বলিয়া মনুষ্য সমাজ আমাদিগকে যতই নিন্দা করুন না কেন, আমরা প্রভাবতীর ঐ কষ্টকে আর কষ্ট মনে করিতে পারি না। পৃথিবীতে মানবের সুখইবা কি, দুঃখইবা কি? পৃথিবীতে সুখও নাই, কষ্ট দুঃখও নাই। ঈশ্বর জ্ঞানই সুখ, ভগবৎভক্তিই

শক্তি;—আর ইহার অভাবই দুঃখ। সেই সুখ, সেই শক্তি যে জীবনে পাইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে? আর সে সুখ যে জীবনে পাইল না, ইহজীবনে পরম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরিপালিত, সুখবিলাসের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহার ন্যায় অসুখী জীব এই ভূমণ্ডলে আর নাই। সংসার যাহাকে সুখ বলিয়া থাকে, তাহা ক্ষণস্থায়ী। পাঠক, প্রভাবতী এই ক্ষণস্থায়ী সুখ, ভোগবিলাস হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ বা আক্ষেপ করিও না; অনন্ত জীবনের সুখশান্তির প্রলোভন ঐ কাঙ্গালিনীর মনকে আকৃষ্ট করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। চাহিয়া দেখ,—রাজা কিম্বা পাগলিনী আর ইহার মনকে ক্লিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। চেষ্টা কি কম হইতেছে?—যাহা লিখিতে শরীর সিহরিয়া উঠে, এমন সকল ঘৃণিত কার্য্য করিয়া প্রভাবতীকে পাপে ডুবাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে; অপমানের উপর অপমান, নির্যাতনের উপর নির্যাতন, শিবনারায়ণ ক্রমাগত প্রভাবতীকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একদিনের জন্যও আর প্রভাবতীর মন বিচলিত হয় নাই, সেই রজনীর পর একদিনও আর প্রভার মুখ মলিন হয় নাই। সংসারের লোকেরা প্রভার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া মনে ভাবিয়াছে, প্রভা দুঃখে ও কষ্টে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু প্রভার ঐ চক্ষের জল কেবল ভাগবৎভক্তিই প্রকাশ করে। প্রভার মুখে হতাশের সঙ্গীত শুনিয়া সংসারের কত ব্যক্তি শিবনারায়ণকে গালাগালী করিয়াছে, কিন্তু প্রভার ঐ সঙ্গীত—"জীবনে কিছুই হইল না, কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিলাম না" জগতে কেবল এই কথাই প্রচার করিতেছে। মূর্খ জগৎ তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? প্রভাবতী এই প্রকার অনন্ত রাজত্বের অধিকারিণী হইলেন, প্রভার ভালবাসায় মুগ্ধ প্রজাপুঞ্জ দিনে দিনে প্রভার প্রতি আরো অনুরক্ত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া শিবনারায়ণ প্রজাদিগকে নানা প্রকারে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। খাজনা বৃদ্ধি করিবার ছলনা করিয়া, নবরাজ্ঞীর নজরের ছলনা করিয়া, নানা প্রকারে প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন, সেই উৎপীড়নের ফল কি হইল, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। হতভাগ্য অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিসের অভাবে বাঙ্গলার এই দুর্দ্দশা?

আমরা ধীরে ধীরে বাঙ্গলার কতকগুলি অপকৃষ্ট জীবের অপকৃষ্ট চরিত্র পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। বাঙ্গলার এই সকল অপকৃষ্ট চরিত্রের কথা যখন ভাবিতে বসি, তখন কেবলি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। আমরা বাঙ্গালী, পাঠকগণও বাঙ্গালী, এই বাঙ্গলারাজ্যে কি আছে, কি নাই, তাহা আমাদিগের নিকট অবিদিত নাই। আমাদের জীবনে কি আছে, কি নাই, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি। কোন্ পাপে বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা এত অপকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় দেখাইয়া সভ্য সমাজে হাস্যাস্পদ হই-তেছে, তাহা আমরা একবার আলোচনা করিব। বুদ্ধি এবং প্রতিভায় যে জাতি পৃথিবীর যে কোন জাতির সমকক্ষ হইতে পারে, সেই জাতির এত দুর্দ্দশা কেন? বুদ্ধিমান, অশিক্ষিত বাঙ্গালী জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে কত ভীরুতাও নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবি-দিত নাই। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি, চক্ষু খুলিয়া তাঁহারা স্বজ্ঞানে যে সকল অপকৃষ্ট, জঘন্য কার্য্য করিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের হীনতা প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাহাও কাহার অবিদিত নাই। স্কুলে যাও, ডাক্তারখানায় যাও, উকীলের বৈঠকখানায় যাও, ব্যবসাদারের গৃহে যাও, ধর্ম্মমন্দিরে যাও, যেখানে ইচ্ছা বাঙ্গলার সেই খানে যাইয়া অনুসন্ধান কর, দেখিবে, বাঙ্গালীর সাহস নাই, অধ্যবসায় নাই, চরিত্র নাই, স্বদেশের প্রতি মমতা নাই,—হৃদয় নাই; বিবেকের মস্তকে পদনি-ক্ষেপ করিয়া বাঙ্গলা এক অপূর্ব্ব জীবের অভিনয় দেখাইতে যেন জগতে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি দেশের জন্য চিন্তা করিতেছ,—জাতীয় ভাষার উন্নতির কামনা করিতেছ? ঐ যে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক শেষ করিয়া প্রবীণ বিদ্বান চুরট মুখে দিয়া, হ্যাট্ কোট পরিয়া আসিতেছেন, উনি তোমাকে উন্মত্ত ক্রীড়ক করি-বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। হ্যাট কোট! বাঙ্গালী কি অপকৃষ্ট জীব, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ —যে জাতি স্বদেশের মায়া মমতা ভুলিয়া পরঅনুসরণে

জীবন কাটাইতে প্রস্তুত হয়, সে জাতির মধ্যে আবার স্বদেশহিতৈষণার ভাব কি দেখিতে চাও ? তুমি স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত উচিত মনে করিয়া রাস্তা দিয়া রমণীদিগকে পদব্রজে লইয়া যাইতেছ,—ঐ দেখ, শত শত লোক বিষ-নয়নে ঐ অবলাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতেছে, এবং ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া কি প্রকার বিভৎস ব্যাপারের অভিনয় দেখাইতেছে। একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও একটী ভদ্রমহিলাকে একজন সাহেব রেলেরগাড়ীতে আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া, তোমার মনে ঘৃণা উপস্থিত হওয়াতে তুমি অবলাকে রক্ষা করিতে যাইতেছ, ঐ দেখ তোমার শত শত ভ্রাতা তোমাকে যাইতে নিষেধ করিতেছে, প্রহার সহ্য করার ভয়ে তাহারা কেহই অগ্রসর হইতেছে না, তোমাকেও প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে ; বলিতেছে,—যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, বাঙ্গালীবেশে রেলের গাড়ীতে না গেলেই হয়, আমাদের কি ওসব সাজে !' তুমি দেশহিতৈষী, তোমার মনে একথা স্থান পাইল না, তুমি ভাবিলে, পেণ্টুলন কোট পরিধান করিয়া যে সাহেবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, সে কাপুরুষ, কারণ সে দেশের কোটী কোটী লোকের বিষয় না ভাবিয়া আপনিই রক্ষা পাইবার উপায় করিল ;—কিন্তু যাহারা ধূতি পরিধান করিয়া অহরহ রেলপথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে, তাহা নিবারণের উপায় কি ? ইহা ভাবিয়া তুমি যদি হস্তের জামা গুটাইয়া সাহেবের নিকট অগ্রসর হও, তবে সাহেব যখন তোমাকে ভীমরবে আক্রমণ করিবে, তখন চতুর্দ্দিক হইতে—'কেমন বলেছিলাম ত' বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, এবং হাসিতে থাকিবে। আর যদি তুমি বীরত্ব দেখাইয়া সাহে-বকে পরাজয় করিতে পার, তখন দূরে থাকিয়া দক্ষিণ হস্তোত্তলন করিয়া তোমার স্বদেশী ভ্রাতারা বলিতে থাকিবে—'মার, মার পাজিকে, মার পাজিকে।' কেমন জাতীয় চরিত্র, দেখিলে ? তুমি বাঙ্গলা পুস্তকের গ্রন্থ-কার, স্বদেশের মায়ায়,—জাতীয় ভাষার উন্নতি না হইলে দেশের কিছুই হইতে পারে না, মনে ভাবিয়া বাঙ্গলাভাষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমরা জানি তোমার লাঞ্ছনার শেষ নাই। অন্যান্য সভ্য সমাজে একখানি নূতন পুস্তক বাহির হইলে গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রত্যেকেই এক একখান ক্রয়করিয়া থাকে, তোমাকে তোমার স্বদেশী ভ্রাতারা আরো নিরুৎ-সাহের শীতল জলে নিক্ষেপ করিতেছে ;—"ঐ সকল অসার পুস্তক, উহা পড়ে কি হবে ? কত পুস্তকই বা পড়া যায়, বাঙ্গলাগ্রন্থ ছারপোকার ন্যায় বাড়িতেছে"

এই প্রকার বলিয়া তোমাকে উপেক্ষা করিতেছে; এদিকে বাজারের দেনায় তুমি অস্থির হইয়া বেড়াইতেছ। "অঙ্গুলির কর গণিয়া যে দেশের সাহিত্য গণনা করা যায়, সে দেশে আবার অনেক পুস্তক হইয়াছে" ইহা বলিয়া তুমি সকলকে নিরস্ত করিতে যাও, দেখিবে, তোমাকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিবে। আর তুমি জাতীয় পরিচ্ছদ এক প্রকার হওয়া উচিত, ইহা মনে ভাবিয়া ধুতি চাদর ব্যবহার করিতেছ, ঐ বাঙ্গালী সাহেব তোমাকে 'উলঙ্গ' বলিয়া উপহাস করিতেছেন,—তোমার শিশুকে তুমি অস্বাভাবিক লজ্জা শিক্ষা না দিয়া উলঙ্গ রাখিয়াছ বলিয়া তোমার মতকে কত ঘৃণা করিতেছেন। আর তুমি নৈতিক উন্নতি এবং ধর্ম্মোন্নতিকে জাতীয় অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছ,—ঐ যে মিলের শিষ্য, কম্‌টীর শিষ্য, স্পেন্সারের শিষ্য আসিতেছেন, উনি তোমাকে কি বলিতেছেন শুন;—"লোক গুলো ক্ষেপেছে, কেবল কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করে জাতিটাকে অধঃপাতে দিতে বসেছে।" এই ত বাঙ্গলার অবস্থা!! হায়, সোণার বাঙ্গলার এ অবস্থা কেন হইল? হরিহর স্কুলের ছাত্র, ইহার প্রতি আমাদের কত আশা ভরসা ছিল, হরিহর আজ জেলে কেন?—হরিহর ভীরু কেন, কাপুরুষ কেন, দুর্ব্বল কেন, কেন সৎপথে অটল থাকিতে পারিল না, কেন হরিহরের পদস্খলিত হইল? বাঙ্গলার দুর্দ্দশার কারণ এক মাত্র শিক্ষার অভাব। হরিহর স্কুলে পড়িয়া কত বৎসর কাটাইলেন, তবুও ইহার শিক্ষা হয় নাই, এ কি কথা? হরিহর কতপুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, স্কুলে না হউক, গৃহে বসিয়া কত বড় বড়, বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তক পড়েছেন, হরিহর শিক্ষা পায় নাই, এ কি কথা? আমরা বলি, হা, হরিহর শিক্ষা পায় নাই? বালক প্রথম শিক্ষা পায় কোথায়? মাতার নিকট, বাড়ীতে। তারপর শিক্ষা পায় কোথায়? শিক্ষকের নিকট, স্কুলে। তারপর শিক্ষা পায়,—সংসারে, বন্ধুবান্ধবের নিকট,—জাতীয় ভাষার নিকট। এই যত স্থানের কথা বলিলাম, ইহার কোন স্থানেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। বালকের প্রথম শিক্ষার স্থান জননীর ক্রোড়ে; সন্তানকে দুগ্ধপান করাইবার সময় জননী সন্তানের ভিতরে যে বীজ রোপণ করিয়া দেন, তাহাই ভাবী জীবনের মূলভিত্তি হয়। আমেরিকার অদ্বিতীয় হিতৈষী ওয়াসিংটনের জীবন অধ্যয়ন করুন, পারকারের জীবনকাহিনী শ্রবণ করুন, ম্যাট্‌সিনির দুঃখপূর্ণ জীবনের ঘটনার পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন করুন, দেখিবেন, ইহাঁদিগের জননীরা বাল্যকালে ইহাঁদিগের অন্তরে যে বীজ রোপণ

করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই ভাবীজীবনের প্রকৃত শোভা সৌন্দর্য্য হইল :—ইহাঁদিগের জীবনে ইহাঁদিগের জননীগণ যে শক্তির অঙ্কুর দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

ওয়াসিংটন, পারকার, ম্যাটসিনি, ইহাঁদিগের ন্যায় দেশহিতৈষী আর কোথায় আছে ? ইহাঁরা সকলে জননীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। আমাদের দেশে জননীদের কি কার্য্য ?—ছেলেটী বড় হলেই হয়, তবেই পুত্রবধূ গৃহে আসে, কেবল দিবা রাত্রি এই কামনা! পিতা মনে করেন, ছেলেটী যদি দশটাকা আনিতে পারে, তবেই হয়। চরিত্র গঠনের প্রতি বা স্বভাবের প্রতি এদেশের কোন জনক জননী দৃষ্টিপাত করেন না। সময়ে সময়ে এমন ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—ছেলেটী যখন দুষ্টলোকদিগের সহিত মিশিতে যায়, যখন ব্যভিচার করিতে যায়, তখন পিতা মাতা কিছু বলেন না, কিন্তু ছেলেটী যদি কোন নৈতিক বিদ্যালয়ে গেল, কিম্বা কোন ধর্ম্ম সমাজে গেল, তবেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। যে দেশের এই প্রকার অবস্থা, সে দেশে জনক জননীর দ্বারা সন্তানের কি প্রকার চরিত্র গঠন হয়, তাহা পাঠকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন। হরিহরের পিতার ত খোজই ছিল না, সাধের জননী দিন রাত্রি কেবল সন্তানের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কুলীন-ঘরের যে প্রকার দুর্দ্দশার চিত্র সকল আমরা চিত্র করিয়াছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, হরিহর কি প্রকার শিক্ষার মধ্যে পরিপালিত হইয়াছেন। তারপর হরিহর স্কুলে গেলেন, সেখানকার শিক্ষার কথা আর কি লিখিব! কথার প্রতিশব্দ মুখস্থ হইলে, বর্ণাশুদ্ধিজ্ঞান হইলে, ব্যাকরণের জটিলতত্ত্ব বোধগম্য হইলেই হইল, আর সাহিত্যশিক্ষার কি বাকী রহিল ? ইতিহাস ? ঘটনার পর ঘটনা স্মরণ কর,—নামাবলী, বংশাবলীর তালিকা মুখে মুখে রাখ, কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনাটী ঘটিয়াছে, মনে রাখ, বস্, ইতিহাস শিক্ষা হইল। হরিহর অনেক ইতিহাসের অনেক জীবন পাঠ করিলেন, কিন্তু একটা জীবনের ভাবেও অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেন না ? এত সাহিত্য পড়িলেন, এত পুস্তক পড়িলেন, একটা সাধারণ জ্ঞানও লাভ করিতে পারিলেন না ? কি আশ্চর্য্য, দেশের ছাত্রগণ এত পুস্তক পড়িতেছেন, তবু জীবন গঠিত হইতেছে না, তবুও চরিত্র হইতেছে না, তবুও পরজীবনে মনুষ্যত্ব দেখা যাইতেছে না!! পুস্তক মুখস্থ করা, আর ভাবগ্রহণ করা এক কথা নহে। ভাবগ্রহণের এমনি শক্তি যে, একটী ঘটনার

ভাবে একটী ছাত্র মোহিত হইয়া জীবনপথে চিরকাল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। ঘোড়ার অর্থ অশ্ব মুখস্থ করিয়া রাখিলে যে বালক কখনও ঘোড়া দেখে নাই, সে ঘোড়া কি প্রকার, তাহা কি বুঝিতে পারে? অথচ দেশের শিক্ষা এই প্রকার। হরিহরেরও তাই হইল; হরিহর স্কুলে কত সাহিত্য কাব্য, দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস পড়িলেন, সকলি পণ্ডশ্রম হইল, কোন ভাব গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কাহার দোষ?—শিক্ষকের দোষ, শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। শিক্ষক যদি মানুষ হইতেন, পুস্তকে রাশীকৃত সঞ্চিত রত্নের এক কনিকামাত্র একটী ছাত্রের জীবনে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ছাত্রকে মানুষ করিয়া দিতে পারিতেন। আমাদের দেশে স্কুল প্রভৃতিতে যে সকল পুস্তক অধীত হয়, তাহাতে কি সার কথা, ভাল কথা নাই? রাশি রাশি রহিয়াছে, কিন্তু সে সকল দান বা করে কে, গ্রহণ করিতে বা জানে কে? শিক্ষাপ্রণালীর দোষ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে হইবে, ভাব গ্রহণের প্রয়োজন কি, কেবল মুখস্থ কর, কেবল মুখস্থ কর, এই রব চতুর্দ্দিকে শুনিতে পাওয়া যায়; যদি কোন ছাত্র ভাব সমুদ্রে ডুবিলেন, তবে তাঁহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইল;—সে ছাত্র আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইল না,—সে ছাত্র অকর্ম্মণ্য দলে স্থান পাইল। স্কুলের শিক্ষা এই প্রকারে শেষ করিয়া হরিহর সংসারে গেলেন। বাঙ্গলার সংসার কি প্রকার শিক্ষার স্থান, তাহা আমাদের পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। তারপর জাতীয় সাহিত্য;—তাহা ত নাই বলিলেই হয়,—জাতীয় সাহিত্য একথাই বাঙ্গলা গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা যায় না। আমাদের দেশের বিজ্ঞ লোক যাঁহারা, তাঁহারা ইংরাজি লইয়াই ব্যস্ত,—কথায় ইংরাজি, লেখায় ইংরাজি, সকল ইংরাজিতে। আমাদের দেশের অনেকে যেন ইংরাজি গ্রন্থের অপ্রতুল দেখিয়া তাহা পূরণে যত্নবান হইয়াছেন;—সভার কার্য্য ইংরাজিতে, আফিসের কার্য্য ইংরাজিতে, বক্তৃতা ইংরাজিতে, সব ইংরাজি;—জাতীয় ভাষা আবার কি? আমরা বাঙ্গলার বর্ত্তমান শতাব্দীর এই একটী প্রধান দুর্দ্দশা দেখিতেছি, জাতীয় ভাষার প্রতি লোকের আদর নাই, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই। জাতীয় ভাষা ভিন্ন কি জাতির হৃদয়ের সমস্ত ভাব প্রকাশিত হইতে পারে,—সমস্ত হৃদয়ের ভাবের কথা না শুনিলে কি অন্য হৃদয় বিকশিত হইতে পারে? কখনই পারে না। জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পৃষ্ঠা কেবল এই এক কথা বলিতেছি,—যদি জাতির উন্নতি

চাও, তবে জাতীয় ভাষার উন্নতি কর। ফরাশিবিপ্লবের সময় সামান্য কুটীরে বসিয়া ভল্‌টেয়ার সামান্য লেখনী সহায়ে যে হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ দেশে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাতে যে ফল হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। জাতীয় ভাষা? কেন অন্য ভাষায় কি হয় না? না— হয় না। জাতীয় ভাষা ভিন্ন হৃদয়ের সমস্ত ভাব অন্য হৃদয়ে মুদ্রিত হয় না। রুসো, ভল্‌টেয়ার সামান্য লেখনীর দ্বারা যাহা করিয়া গিয়াছেন, কোন্ দেশে কোন্ ক্ষমতাশালী রাজা আজ পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারিয়াছেন? হতভাগ্য বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্যের প্রতি লোকের অনুরাগ নাই, ইহার শ্রীবৃদ্ধির কামনা নাই। হরিহর সংসারের সাহিত্যভাণ্ডারে যাইয়া রসিকতার কথা শিখিলেন,—প্রণয়গাথা পড়িলেন,তারপর তাহার কপালে যে দুর্দ্দশা ঘটিল,তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। হরিহরের চরিত্র গঠিত হইল না;—ভীরু, অধ্যবসায় শূন্য, ধর্ম্মশূন্য, মনুষ্যত্বহীন হরিহর বাঙ্গলার কীর্ত্তিধ্বজা তুলিয়া কারাবাসে গেলেন। ম্যাট্‌সিনিও কারাবাসে জীবন কর্ত্তন করিয়াছিলেন, হরিহরও কারাবাসে গেলেন। একজনকে পৃথিবী একবাক্যে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে,—আজ হউক, কাল হউক, একদিন পূজা করিবে; আর একজনের কথা লইয়া মেকলে সাহেব ইতিহাসে কত রসতরঙ্গের অবতারণা করিয়া জগতের নিকট বাঙ্গালী জাতিকে হাস্যাস্পদ করিলেন। একজনকে দেখিবার জন্য জগৎ মস্তক উত্তোলন করিল, আর একজনকে দেখিবার সময় জগৎ নয়ন ফিরাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মানব জাতির ইতিহাসের দুটী বৈষম্যময়, দুটী বৈচিত্র্যময় চিত্র। কেন এ প্রকার হইল? কেনা স্বীকার করিবেন, একজনের চরিত্র ছিল, আর এক জনের চরিত্র নাই;—একজন ধার্ম্মিক, জীতেন্দ্রিয়-বীর; আর একজন নরকের কীট,রিপুর জ্বালায় অস্থির,—কাপুরুষ, প্রবঞ্চক। একজনের হৃদয় দেশের উন্নতির কামনায় বিহ্বল, আর এক-জনের হৃদয় স্বার্থ চিন্তায় মলিন, কিম্বা সহজ ভাষায় বলিতে হইলে—একজন মনুষ্য, আর একজন পশু। মনুষ্য কাহাকে বলি,—হস্তপদ বিশিষ্ট প্রাণী, যাহাতে চরিত্র আছে। পশু কাকে বলি,—হস্তপদ বিশিষ্ট প্রাণী—চরিত্রহীন। বাঙ্গলা দিন দিন যে প্রকারে দ্রুতগতিতে চরিত্রহীন মনুষ্যের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে, এই দেশের প্রতি আর আশা ভরসা হয় না। শিক্ষার অভাবে বাঙ্গলা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। হায়, এদেশের জনক জননী, শিক্ষক, জাতীয়ভাষার গ্রন্থকারগণ কি ভাবী সন্তানদিগের অন্তরে কেবলি গরল

চালিতে রত থাকিবেন? সঙ্গীতপ্রিয়, বিলাসপ্রিয় ইটালীর আবার উন্নতি হইল, এ দেশের কি হইবে না? প্রকৃত শিক্ষা যত দিন না হইবে, তত দিন কোন প্রকারেই হইবে না। প্রকৃত শিক্ষা যত দিন না হইবে, ততদিন এই চরিত্রহীন হরিহর, সুশীলা, আর জ্ঞানদার চিত্র লইয়াই আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী সুশীলার পত্র।

হরিহর কারাগারে থাকিয়া প্রায়ই শিবনারায়ণের পত্রাদি পাইতেন। বসন্তকুমারীকে পথের ভিখারিণী করা হইয়াছে, যখন হরিহর বাবু শুনিলেন, তখন তাহার বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। সুশীলা যে হরিহরের স্ত্রী, তাহা শিবনারায়ণ জানিতেন না, সুতরাং সুশীলার পরিণাম যাহা হইয়াছে, তাহা হরিহর জানেন না; তিনি শিবনারায়ণের পত্রে, একজন পাগলিনীর প্রতি গজেন্দ্রনারায়ণের অনুরাগ হইয়াছে, ইহাই জানিয়াছিলেন। হরিহর কোথায় কি ভাবে আছেন, সুশীলা এতদিন পরে একটু একটু জানিয়াছেন, শিবনারায়ণ যে তাহার স্বামীর একজন বন্ধু, তাহাও জানিয়াছেন। সুশীলা যাহা মনে করিয়া শিবনারায়ণের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইতেছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না, হতভাগ্য অসময়ে সংসার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সুশীলা যখন শিবনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ শুনিলেন, তখন একেবারে চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, দিনরাত্রি কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। হরিহরবাবু শিবনারায়ণের নিকট যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া হরিহর কোথায় আছেন, তাহা তিনি জ্ঞাত হইলেন। রাজা গজেন্দ্রনারায়ণের মনে আর স্থান পাইবেন, সে আশা ছিল না, তিনি বুঝিয়াছিলেন,—একদিন কি দশ দিন পরে তাহাকে পথের কাঙ্গালিনী হইতে হইবে। সুশীলা এ সকল উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুতপ্ত অন্তরে স্বামী হরিহরের নিকট নিম্নলিখিত

পত্র খানি লিখিলেন। এই একখানি পত্রে সুশীলার অন্তরের অনুতাপের সকল ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

প্রাণের হরিহর!

কালের চক্রান্তে ভাসিতে ভাসিতে আমি বা কোথায় আসিয়াছি, তুমি বা কোথায় আছ? তোমার জীবনরক্ষার জন্য আমি পিত্রালয়ে থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহার ফল কি হইয়াছে, তাহা কি তোমার শুনিতে ইচ্ছা আছে? তুমি প্রাণে বাঁচিলে বটে, কিন্তু সেই রজনীতে তোমাকে সমস্ত চক্রান্তের কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া আমার জীবনে অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল। সমস্ত কথা দূরদেশে তোমাকে লিখিয়া আর কি করিব?—কালের চক্রান্তে আজ আমি কলঙ্কিনী হইয়াছি! তোমার নিকট সত্য কথাই লিখিব, কারণ আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, একদিন তোমাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া জানিয়াছিলাম, আজও তোমাকেই জীবনের অবলম্বন বলিয়া জানিতেছি;—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। তোমার চরণে আশ্রয় চাহিতেছি, হয় চরণে স্থান দিও, না হয় চরণে ঠেলিও,—অভাগিনী কালের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। আমি কলঙ্কিনী;—সমাজের পীড়নে, পিতা মাতার তাড়নায়, যৌবনের উত্তেজনায়, মনুষ্যের চক্রান্তে আমি আজ কলঙ্কিনী! আমার সতীত্বরত্নকে ডুবাইয়া আমি হাহাকার করিতেছি! দুঃখের কথা কাহার নিকট বলিব? হতভাগিনীর কথা শুনে, এমন লোক আর সংসারে নাই। আমি যদি প্রাণ খুলিয়া কাঁদি, লোকে ঠাট্টা করিয়া কত গালি বর্ষণ করিতে থাকে। দুঃখিনীর মা বাপ কি সংসারে আছে? যে অভিসার পথে ভ্রমণ করিয়াছে, তাহার দুঃখে বিষণ্ন হইবার লোক কি বাঙ্গলায় আছে? আমার হৃদয়ে দিন দিন অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে,—লোকে আমাকে ঘৃণা করে, তাহাতে আমার আর কষ্টবোধ হয় না, কারণ আমি সত্যই ঘৃণার পাত্রী;—লোকে গালাগালি করে, তাহাতে আর দুঃখ হয় না, কারণ আমি হতভাগিনী। লোকের ঘৃণা, লোকের গালাগালিকে জীবনের ভূষণ করিয়াছি,—আজ তোমার নিকট জীবনের কথা খুলিয়া লিখিয়া তোমার ঘৃণা এবং তোমার গালাগালিকে জীবনের ভূষণ করিব, অভিলাষ করিয়াছি;—তোমার পদরেণু মস্তকে লইয়া কৃতার্থ হইব, মনে করিয়াছি। তুমি আমাকে চরণে ঠেলিবে, তাহা ত নিশ্চয় জানি, কারণ কলঙ্কিনীদিগকে সৎপথে আনে, বাঙ্গলায় এমন লোক নাই।

হরিহর, তবে কি আমি ডুবিয়াছি, তবে কি আমার আর উদ্ধার হইবে না ;—চিরকালের জন্য কি আমি ডুবিলাম ! ! তুমি যখন কলিকাতা পড়িতে, তখন আমাকে একবার লিখেছিলে,—কলিকাতাতে অসহায়া কলঙ্কিনী-দিগকে সৎপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে ;—যাহারা একবার ডুবিয়াছে, তাহাদিগকে তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। তোমার মনে আছে কি ? আমি তোমাকে লিখিয়াছিলাম,—'যে একবার পতিত হয়, সে কি আবার উঠিতে পারে ?— একবার যে কলঙ্কিনী হয়, সে কি আবার পবিত্র হইতে পারে ?' একথার উত্তরে তুমি লিখেছিলে,—"তা পারে ; শরীরে ময়লা লাগিলে যেমন তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করা যায়, অন্তরের ময়লাও সেই প্রকার পরিষ্কার করা যায়,—একবার পতিত হইলেই যে, সে চিরকালের জন্য গেল তাহা নহে, আবার সে উঠিতে পারে, আবার সে সৎ হইতে পারে।" হরিহর, তোমার সেই কথাটীই আজ কাঙ্গালিনীর একমাত্র আশাস্থল হইয়াছে ;—দিনরাত্রি তোমার সেই কথাটী অন্তরে জপ করিতেছি। কি করিলে আমি আবার উঠিতে পারিব, সে উপায় ত জানি না। তোমাদের সেই দেশ-হিতৈষী লোকদিগের নিকটে তুমি কি লিখিতে পারিবে ? কাহার জন্য লিখিতে বলিতেছি ? আমার জন্য। আমি কে ? তোমারি কলঙ্কিনী। হায়, হরিহর, আমি তোমার আর আর সকল স্ত্রী অপেক্ষাও হতভাগিনী,—জ্ঞানদা, কাদম্বিনী, শরৎকুমারী, সকলেই আমাপেক্ষা ভাল, আমি,—হতভাগিনী সকলের পায়ের নীচে থাকিবার উপযুক্ত। আমার চক্ষের জলে আজ সমস্ত কাগজ ভাসিয়া যাইতেছে, মনের কোন কথাই লিখিতে পারিতেছি না ;—আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই,—অবলম্বন নাই। যাঁহার সুখের সাগরে অবগাহন করিয়া স্ত্রীগৌরব সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, কালের প্রভাবে এই হতভাগিনীর স্বভাবের দোষে তিনিও বাম হইয়াছেন,—আজ হউক, কাল হউক, আমি এই রাজভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। তোমার বন্ধু শিবনারায়ণ বাবু প্রজাদিগের হস্তে জীবনত্যাগ করিয়াছেন, আমি যে তোমার স্ত্রী, তাহা তিনি জানিতেন না ;—আমি হলাহল পান করিয়া তাঁহার জীবন নাশেরও কারণ হইয়াছি। হরিহর, তুমি আমাকে চরণে স্থান দিবে, আমার আর সে আশা নাই,—হয় আজ, নয় দশ দিন পরে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব ; তোমার সহিত এ কলঙ্কিনীর আর সাক্ষাৎ হইবে না। আজ তোমার নিকট সকল মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিলাম,—আজ

সরল ভাবে তোমার নিকট সকল কথা বলিলাম, আর গোপন করিব কি জন্য? সংসারে থাকিলে আমার জীবনে আর সুখ হইবে না,—অন্যের ঘৃণার পাত্রী হইয়া আর থাকিতে অভিলাষ নাই। আমি কি করেছি,—শুনিবে? আমি যে রাজার পত্নীরূপে আছি, এই রাজার পূর্ব্ব স্ত্রীকে,—তোমার বসন্তকুমারীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি,—সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছি,—তাঁহার কোলের অমূল্য নিধিকে হত্যা করিয়া সুখের সাগরে ভাসিয়াছি। আর কি করিয়াছি?—ঐ রাজাকে বিষপ্রয়োগ করিয়া তোমার বন্ধু শিবনারায়ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া রমণীকুলের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছি। আমি রমণীকুলে চিরকালের জন্য কালিমা লেপন করিয়াছি,—অবলাজাতির পরিণাম অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছি। আর কি কেহ স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করিবে? আর কি কেহ অবলাদিগের সুখসমৃদ্ধির দিকে চাহিবে?—চির-কালের তরে অবলাজাতিকে পুরুষের পদতলে রাখিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া দিলাম। আমার জীবনকে তুমি ধিক্কার দিবে;—কেবল তুমি কেন? আমি নিজেই ধিক্কার দেই,—যে কয়েকদিন পৃথিবীতে থাকিব, সেই কয়েক-দিনই ধিক্কার দিব। পৃথিবী ত নিশ্চয় পরিত্যাগ করিব; কিন্তু কোথায় যাইব? হরিহর, তুমি আমার বয়সে ছোট, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ, তুমি বলিতে পার, আমার মৃত্যুর পর কি দশা হইবে? তুমি কি ছাই বলিবে? আমি জানি,—আমার অন্তর বলিতেছে,—চিরকাল আমাকে নরকে থাকিতে হইবে,—এই হতভাগিনীর আর গতিমুক্তি নাই,—ইহলোকে নাই, পরলোকে নাই। হরিহর, তুমি কলঙ্কিনীর কথা ভুলিয়া যাইও, আমাকে আর মনে স্থান দিও না,—এই হতভাগিনীর জন্য একবার একবার তোমার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও, আজ বিদায় হই,—হয়ত চিরজীবনের তরে এই শেষ বিদায়। তোমার হতভাগিনী—কলঙ্কিনী—সুশীলা।

এই পত্রখানি সুশীলা অতি সাবধানে হরিহরের নিকট প্রেরণ করি-লেন। শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি যেন জগৎসংসারকে অন্ধকারের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন,—রাজবাড়ী শূন্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হরিহরের পত্র পাইয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, মনে মনে ধার্য্য করিয়া, তিনি অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরিহরের পত্র।

হরিণবাড়ীর জেলের একটী ক্ষুদ্র গৃহ হরিহরের বসতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই গৃহে হতভাগ্য কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেন। বন্ধুবান্ধব-শূন্য-স্থলে বাস করা কি প্রকার কষ্ট, তাহা হরিহর এবার বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। হরিহরের মনে স্ফূর্ত্তি নাই, শরীরের কান্তি নাই, অনাহারে, অনিদ্রায় ও নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় হরিহর একবারে মলিন হইয়াছেন। অপরাধ করিয়া কারাবাসী হইয়াছেন,—মনের প্রফুল্লতা কি প্রকারে থাকিবে? হরিহরের নিকট পৃথিবী অসার ও সুখশূন্য বোধ হইতেছে। সুশীলার মৃত্যু হইয়াছে,—জীবনের অভিন্ন বন্ধুর সহিত আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই;—অভাগা রজনীতে চক্ষের জল ফেলিয়া বালিশ্ সিক্ত করিতেন।—সমদুঃখী বন্ধু নাই, কে হরিহরকে সান্ত্বনা করিবে? মধ্যে মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধু শিবনারায়ণের পত্রাদি পাইতেন, অনেক দিন হইল তাহার পত্রও বন্ধ হইয়াছে,—অভাগা দিন রাত্রি ভাবিতে ভাবিতে শুষ্ক হইতেছেন। এই প্রকার অবস্থায় হরিহর জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন,—বিষম জ্বর, শরীর অগ্নির ন্যায়। কয়েকদিন হইল যশহরের জেলখানা হইতে কতকগুলি কয়েদী হরিণবাড়ীর জেলে বদলী হইয়া আসিয়াছে;—সেই কয়েদীদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল; সেই স্ত্রীলোকটী হরিহরের জ্বরের সময় অসহ্য যাতনা দেখিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, শিয়রে একাকিনী বসিয়া পীড়িত হরিহরের কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই অবস্থায় হরিহর সুশীলার পত্র পাইলেন। হরিহর বারম্বার পত্রখানি পড়িলেন,—পড়িতে যথেষ্ট কষ্ট হইতে লাগিল, তবুও পড়িলেন,—তাঁহার সর্ব্বশরীর দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল,—সুশীলা জীবিত আছে? না,—ভ্রম? বারম্বার নাম পড়িলেন, বারম্বার পত্র পড়িলেন, একবার পত্রখানি বক্ষস্থলে রাখিলেন, একবার চুম্বন করিলেন,—সুশীলা জীবিত? ভগবান, তাই কর। হরিহরের হৃদয়ের মধ্যে যেন আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল,—এই দুরবস্থার সময়

হরিহর যেন মরামানুষ জীবিত পাইলেন। হরিহর জ্বরগায়েই উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কলিকাতার একটী বন্ধুর নিকট একখানি পত্র লিখিলেন, এবং সুশীলার নিকট আর একখানি পত্র লিখিলেন। সুশীলাকে সত্বর কলিকাতা আনিয়া রাখিতে বন্ধুর নিকট লিখিলেন। সুশীলার নিকট নিম্নলিখিত পত্র খানি লিখিলেন।

প্রিয় সুশীলা!

বিষম জ্বরের সময়, ভয়ানক দুরবস্থার সময় যেন স্বর্গের চাঁদ আমার হাতে পাইলাম;—তুমি জীবিত আছ, এ কথা আমার নিকট স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। মকর্দ্দমার পর তোমাকে আনয়ন করিতে আমি লক্ষ্মীপাশা যাইয়া যখন শুনিলাম তোমার মৃত্যু হইয়াছে,—তখন সহসা অন্তরের মধ্যে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহা অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে;—সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি গোপনে তোমার উদ্দেশে অশ্রুজল ফেলিয়াছি,—গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বায়ুকে উষ্ণ করিয়াছি। আজ হঠাৎ তোমার পত্র পাইয়া জানিলাম, তুমি নিদারুণ সমাজের কঠোর অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছ। যখন এত কষ্ট সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছ, তখন আশা হইতেছে, আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আজ তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে জপ করিয়া আমার শরীরের অনেক যাতনা নির্ব্বাপিত হইল। সুশীলা, তোমার সহিত আমার জীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা কি তুমি জান? তোমার হাতে আমার জীবন পাইয়াছি,—এই সংসারের মধ্যে তুমিই আমার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু, তোমার সরল মূর্ত্তি ভাবিলেও আমার হৃদয়ে সুখ পাই, ইচ্ছা হয় এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই,—ইচ্ছা হয় পাখীর ন্যায় পক্ষপুট ধারণ করিয়া নিমিষের মধ্যে তোমার নিকটে উড়িয়া যাইয়া জীবনকে সার্থক করি। পক্ষধারণের সে শক্তি নাই,—শীঘ্র আর তোমার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই;—কেন নাই? তা সকলি আজ তোমার নিকট খুলিয়া লিখিতেছি।

তুমি লিখিয়াছ, তুমি কলঙ্কিনী,—পাপে নিমজ্জিত হইয়াছ,—ডুবিয়াছ; কিন্তু আমি তোমাকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিতেছি। তুমি যে ওখানে আছ, পূর্ব্বে তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তখন পাগলিনীর সমস্ত কথাই শুনিয়াছি। আজ তোমার পত্রে বুঝিলাম, তুমিই পাগলিনী হইয়াছিলে। তুমি কলঙ্কিনী,—কিন্তু আমিও তাই; আমি আজ কেন কারাবাসে আসিয়াছি,

তাহা তুমি জান না, আমি আপন চরিত্রের দোষে কারাবাসের কষ্ট সহ্য করিতেছি।—আমিও পাপী, নরাধম ;—আমি জগৎ সংসারের অবজ্ঞার পাত্র,—সমস্ত সংসারের ঘৃণার পাত্র। আমাকে যখন আমি রাখিয়াছি,—অর্থাৎ আমি যখন আত্মহত্যা করিয়া মরি নাই, তখন তোমাকে কেন আমি ভাসাইয়া দিব ?

সমাজের কথা ? সে জন্য তুমি কোন চিন্তা করিবে না। পুরুষ কলঙ্কিত হইয়া যখন সমাজের শীর্ষ স্থানে বসিবার অধিকার পায়, তখন রমণী যে কেন পাইবে না, তাহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আমার সম্বন্ধে ত কথাই নাই,—অসৎ পুরুষ বারবার পাপহ্রদে ডুবিয়া, জীবনকে কলুষিত করিয়াও যখন আবার সতীসাধ্বী অবলাদিগের ভালবাসার পাত্র হয়, তখন অসতী স্ত্রী কেন যে পুরুষের ভালবাসা পাইবে না, তাহা আমি বুঝি না। আমার চক্ষে সংসারের এই দুই জনের অধিকার সমান। যদি অসৎ পুরুষ সমাজে স্থান না পায়,—সতীর ভালবাসার পাত্র না হয়, তবে অসৎ স্ত্রীকেও সমাজে স্থান দেওয়া উচিত নহে, স্বামীর ভালবাসা দেওয়া উচিত নহে। একজন অধিকার পাইবে,—বারম্বার জঘন্য কার্য্য করিয়াও সমাজে স্থান পাইবে, আর একজন পাইবে না, এ কথাকে আমি ঘৃণা করি। নিরপেক্ষ ন্যায়ের চক্ষে দেখিলে আমার বোধ হয় সমাজে তোমার আশ্রয় পাওয়া উচিত। যদি কঠোর সমাজ অবিচারের দ্বারা চালিত হইয়া তোমাকে স্থান না দেয়, তুমি চিরদিন আমার নিকট সমান অধিকার পাইবে। আমার হৃদয় কি জগতের আর কেহ জানে ? আমার অন্তরের মধ্যে কত অসৎ কামনাকে পরিপোষণ করিয়াছি, কত অসৎ ভাবকে স্থান দিয়াছি, সমাজ কি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানে ? আমি যেমন সমাজে আশ্রয় পাইতেছি, এই প্রকার কত রমণী যে অসৎ চিন্তাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া সমান অধিকার পাইতেছেন,তাহার গণনা করা যায় না। তোমার সহিত তাহাদিগের বিভিন্নতা এই,—তুমি সরল ভাবে সকল কথা স্বীকার করিতেছ, তাহারা কপটতার আচ্ছাদনে সকল ঢাকিয়া রাখিয়াছে ;—তুমি ধরা পড়িয়াছ,—তাহারা আজও ধরা পড়ে নাই। এই অপরাধের জন্য সমাজে বৈষম্য ভাব হওয়া উচিত নহে ;—যে সংশোধন হইতে চায় তাহাকে সমাজে আশ্রয় দেওয়া উচিত। যে সংশোধন হইতে চায়, একথা কেন লিখিলাম ? যে সংশোধন হইতে ইচ্ছা করে না, তাহার দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট হইতে পারে। তোমার

অন্তরে গত কার্য্যের জন্য যখন অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তোমাকে অবশ্য সমাজে আশ্রয় দেওয়া উচিত। আর আমার কথা?—আমিও ত অপরাধী, —উভয়েই ডুবিয়াছি,—যদি কূল পাই উভয়েই রক্ষা পাইব,হাত ধরাধরি করিয়া উঠিব,আর যদি কূল না পাই,উভয়েই হাত ধরাধরি করিয়া ডুবিয়া মরিব;—বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না,বিচ্ছিন্ন হইতে চাই না। ন্যায়ের কথা ত এই বলিলাম। আবার যখন হৃদয়ের পানে তাকাই, তখন কি দেখি? দেখি—হৃদয় মন তোমার জন্য অস্থির। তোমাকে রক্ষা করা, তোমাকে উদ্ধার করা আমারই কর্ত্তব্য ছিল। লক্ষ্মীপাশার দস্যুদিগের হস্তে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমিই কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি;—আজ মনে হইতেছে, কেন আমি তাহাদিগের কথা বিশ্বাস করিলাম, কেন তোমার অন্বেষণ করিলাম না, কেন তোমার জন্য সময় দিলাম না? যদি সময় দিতাম, যদি তোমাকে পাইতাম, তবে তুমিও আজ পাপের জ্বালায় অস্থির হইতে না, আমিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতাম না। যে সমাজে তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, সে সমাজে যে তোমার এই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিবে তার আর বিচিত্র কি? তোমার কলঙ্কের জন্য, তোমার অপযশের জন্য আমিই দায়ী,—আমিই কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, সে জন্য তুমি কাতর হইতেছ কেন? আমার অপরাধে তুমি কলঙ্কিনী হইয়াছ, সে পাপের জন্য আমিই পুড়িয়া অঙ্গার হইব, তুমি কাতর হও কেন? নির্দ্দয় সুশীলা, তুমি লিখিয়াছ, তুমি আত্মহত্যা করিয়া মরিবে।—কিসের জন্য? আমার অপরাধের জন্য? যদি তাহা হয়, তবে নরকেও আমার স্থান হইবে না। যদি আমার প্রতি তোমার একটুও মমতা থাকে, তবে কখনও আত্মহত্যা করিবে না। আজ তোমার নিকট যাইতে পারিলে হৃদয়ের সকল ভাব তোমাকে বুঝাইতে পারিতাম, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় আমার পায়ে শৃঙ্খল দিয়া আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে। আজ নিজের অপরাধের জন্য, কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য, এই নির্জ্জন গৃহে অভাগা অশ্রুজলে ভাসিতেছে,—আর কেহ আমার দুঃখ জানে না, কেহ এ হতভাগার দুঃখ দেখিল না। হায়, আর কত দিনে পায়ের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইব! সুশীলা, আমি আমার একজন বন্ধুকে লিখিলাম, তিনি তোমাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিবেন; তাঁহার আশ্রয়ে আসিতে তুমি কখনও কুণ্ঠিত হইবে না। যখন আমি মুক্ত হইব, তখন তোমাকে গ্রহণ করিব। তোমারি—হরিহর।

নবম পরিচ্ছেদ।

যোগজীবনে দীক্ষা।

সরোজকুমারের শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইতেই প্রভাবতী চেতনা লাভ করিলেন। সেই প্রজারা জননীর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিল,—'আমরা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আর কখনও করিব না, রাজার রক্তে আর আমাদিগের হস্ত কলুষিত করিয়া প্রতিশোধ তুলিব না;' এই বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া তাহারা রাজার নৌকার দিকে চলিল। রাজা তখন ভয়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; নৌকায় আর কেহই ছিল না। প্রজারা যাইয়া রাজাকে নিদ্রার ক্রোড় হইতে জাগাইয়া তুলিল; তারপর সংক্ষেপে সেই রজনীর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল,—'মহারাজ, আমরা সামান্য দুঃখীপ্রজা,—মূর্খ, জ্ঞানহীন, আমরাও রাজ্ঞীর ব্যবহারে, সৎস্বভাবে মোহিত হইয়াছি,—এমন কি, আজ তিনি যদি বাধা না দিতেন, তবে এতক্ষণ আপনার রক্তে আমাদিগের হস্ত কলুষিত হইত,—এতক্ষণ আমরা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতাম। আপনি কোন্ অপরাধে এই অমূল্য নিধিকে তুচ্ছ করিতেছেন, আমরা বুঝি না;—যিনি দিন রাত্রি আপনার মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাহার প্রতি আপনার জঘন্য ব্যবহার,—অত্যাচার ও উৎপীড়ন; ইহা কাহার প্রাণে সয়? আমাদিগের সহিত চলুন, রাজ্ঞীকে দেখিয়া মোহিত হইবেন।'

রাজা ভয়ে, বিস্ময়ে নৌকা হইতে ধীরে ধীরে উঠিলেন। প্রভাবতীর কথা শুনিয়া তাহার দুনয়ন হইতে জল পড়িতেছিল,—আপন দুষ্কর্ম্মের জন্য মর্ম্মযাতনা উপস্থিত হইতেছিল। সুশীলার বিশ্বাসঘাতকতায় ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অন্তরে বিষম অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল,—প্রজাদিগের মুখে প্রভাবতীর কথা শুনিয়া সেই অনুতাপ আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল;—যে প্রভাতীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছেন, তিনি আজও রাজার মঙ্গল কামনা করিতেছেন,—তাহারই কল্যান কামনায় রত আছেন, ইহা শুনিয়া রাজার হৃদয় মন আত্ম-গ্লানিতে অবসন্ন হইয়া উঠিল,—পৃথিবীর সুখদুঃখ, হর্ষ বিষাদ তাহার নিকট যেন

এক হইয়া গেল, সেই গভীর রজনীতে কম্পিত কলেবরে, অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ প্রজাদিগের সহিত চলিলেন। কোথায় চলিলেন?—মরিতে? রাজা অন্যমনস্ক, কোথায় যাইতেছেন, সে দিকে চিত্ত নাই,—কেবল আপন অন্যায় ব্যবহারের কথা ভাবিতেছেন;—মৃত্যুকেও তাহার আর ভয় হইতেছে না,—মৃত্যু হইলে বরং সকল প্রকার মনোকষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। প্রজারা রাজাকে লইয়া সেই শ্মশানে উপস্থিত হইল; রাজা অন্যমনস্ক অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—একি?

প্রজারা উত্তর করিল,—শ্মশান,—আপনার সরোজকুমারের শ্মশানভূমি।

রাজা পুনঃ বলিলেন,— আমাকে এই শ্মশানে আনিয়াছ কেন? অনুতাপে দগ্ধ করিতে, না—জীবিত অবস্থায় চিতায় ভস্ম করিতে?

একজন প্রজা ধীরে ধীরে বলিল,—না,—তাহা নহে, আমাদের জননীকে দেখিতেছেন? উহাকে দেখাইতে আপনাকে আনিয়াছি। কথা বলিবেন না, আস্তে আস্তে এই স্থানে বসুন।' প্রজাদিগের আদেশে রাজা নীরবে সেই স্থানে বসিলেন, সম্মুখে একটী দেব কন্যার মূর্ত্তি, রাজা অনিমেষ নয়নে বারম্বার তাঁহার পানেই তাকাইয়া দেখিলেন,—সাড়া শব্দ নাই, নিশ্চল অঙ্গ, স্পন্দন রহিত,—এক চিত্তে ধ্যাননিমগ্নমূর্ত্তিকে দেখিতে লাগিলেন। এ প্রকার মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত রাজার চক্ষে দেখা ঘটে নাই;—তাঁহার হৃদয় মন সেই গম্ভীর স্থানের গম্ভীরভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল;—তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না,—কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দেব কন্যার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া প্রজারা রাজাকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন জননীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে। জননী নয়ন মেলিয়া দেখিলেন তাহার সন্তানগণ চতুর্দ্দিকে, মধ্যে রাজা লুণ্ঠিত। এ কি প্রকার চিত্র? রাজার এ প্রকার চিত্র কি প্রভাবতী আর কখনও দেখিয়াছেন? চক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু কল্পনায় দেখিয়াছেন,—ধ্যানের সময় দেখিয়াছেন। যাহা ধ্যানের সময় দেখিয়াছেন, তাহাই আজ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, বিধাতার এ কি লীলা! প্রভাবতী রাজার বিনীতভাব দেখিয়া মোহিত হইলেন;— তিনি রাজার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—রাজার কি এবেশ সাজে?

প্রভাবতীর চতুর্দ্দিকস্থ সন্তানগণ ব্যস্ত হইয়া রাজাকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রাজা কোন ক্রমেই মস্তক উত্তোলন করিলেন না।

এই সময়ে সেই বৃদ্ধ হঠাৎ আসিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতী তাঁহাকে আর দেখিবেন, ইহা কখনও মনে করেন নাই, হঠাৎ দেখিয়া অত্যন্ত

চমকিত হইলেন, সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—এ কি দেখিতেছি? প্রভাবতী মৃদুস্বরে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

বৃদ্ধ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, বলিলেন,—এ নরাধম এখানে কেন? এখনি ইহাকে স্থানান্তর হইতে বল, নচেৎ আমার ক্রোধের সম্মুখে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিবে না? পাষণ্ডের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া পৃথিবীর কষ্ট দূর করিব।

প্রভাবতী আস্তে আস্তে বৃদ্ধের চরণ ধরিয়া বলিলেন,—দেব, স্থির হউন। যে জন অনুতাপে দগ্ধ হয়, তাহার প্রতি আর কঠোরভাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। আপনি স্থির হইয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি করুন। আপনার শুভ-দৃষ্টিতে ইহাঁর জীবন পবিত্র হইয়া যাইবে।

বৃদ্ধ বলিলেন,—'তুমিই সাধ্বী, তুমিই ধর্ম্মের উপযুক্ত। পাপীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা বিধেয় নহে, কিন্তু আমাদের এমনি জঘন্য হৃদয়, পাপীকে দেখিলেই ক্রোধ উপস্থিত হয়। তুমিই ধন্য, কারণ তুমি সহিষ্ণুতাকে জীবনের ভূষণ করিতে পারিয়াছ।' এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইলেন। ক্ষণকাল সকলি নীরবে রহিল, রজনীর গম্ভীরতার সহিত শ্মশানের গম্ভীরতা মিশিয়া এক আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিল। ক্ষণকাল পরে রাজা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন;—"আমার ন্যায় নরাধমের কি আর উপায় নাই? বিধাত! আমি কি চিরকালের তরে ডুবিয়াছি? হায়, জগতের কত পাপী ত'রে গেল, আমার কি কোন গতি হইবে না?"

প্রভাবতী এবং বৃদ্ধ, রাজার অন্তরভেদী ক্রন্দনের স্বরে বিদ্ধ হইলেন; বৃদ্ধ আর থাকিতে পারিলেন না,—রাজাকে বলিলেন,—"প্রভাবতীই তোমার গৃহলক্ষ্মী, তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের মূল;—ইহঁাকে হারাইয়াই তোমার সকল গিয়াছে;—হলাহল পান করিয়া মরিয়াছ। ইহঁার চরণ পূজা কর, ইহাঁর চরণামৃত পান কর, ইনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।

এই কথা শুনিতে শুনিতে প্রভার চক্ষু হইতে দর দর ধারে বারি নির্গত হইতে লাগিল, করুণস্বরে বলিলেন,—দেব, এ কি কথা বলিতেছেন? যাঁহার চরণ পূজা করিলে মানুষ পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, দ্বিজ হইতে পারে, তাঁহার চরণকে অবলম্বন করিতে না বলিয়া এ কি অন্যায় আদেশ করিতেছেন? আমাকে ঘোরতর পাপের মধ্যে নিপতিত করিতে কেন এ ইচ্ছা করিতেছেন?

বৃদ্ধ বলিলেন, সাধ্বি, স্থির হও। মানুষকে ভক্তি করিতে না শিখিলে কখনও মানব সর্ব্বদেবের মূলাধারকে ভক্তি করিতে পারে না। আর প্রেমের কথা বলিতে চাও? যে জন সামান্য মনুষ্যকে অন্তরের সহিত প্রেম করিতে না পারে, ভালবাসিতে না পারে, তার পক্ষে অনন্তদেবকে প্রেম করা, ভালবাসা অসম্ভব। তোমার চরণে এমন কিছুই নাই, যাহাতে রাজা ত্রাণ পাইতে পারেন,কিন্তু আবার তোমার চরণেই রাজার ত্রাণের সর্ব্বস্ব আছে। কেন বলিতেছি, শুনিবে? তোমাকে যদি রাজা সরলভাবে ভালবাসিতে পারেন, অন্তরে ধারণ করিতে পারেন, তবে রাজার সকল রিপু জয় হইল, মনে করিবে। তোমার চরণামৃত যদি পান করিতে পারেন, তবে ভেদাভেদ-জ্ঞান—মানবের সর্ব্বনাশের মূল যে অহঙ্কার, তাহাকে রাজা জয় করিতে পারিলেন, বুঝিবে; অতএব বিরক্ত হইও না, আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই হউক।"প্রভাবতী নীরব হইলেন, বৃদ্ধের আদেশে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ প্রভার পদ বারম্বার চুম্বন করিলেন, বলিলেন;—প্রভা তুমি মানবী নও, তুমি এক্ষণ দেবী, প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি সদয় দও, আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে ক্ষমা কর।

প্রভাবতীর চক্ষের জলে রাজার মস্তক সিক্ত হইল,—প্রভার অশ্রুতে রাজার শরীর যেন শীতল হইতে লাগিল,—রাজা যেন পুনঃজন্ম লাভ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ প্রভাবতীর কল্যানকামনার অশ্রুপাত দেখিলেন, রাজার স্বার্থত্যাগের এবং রিপু জয়ের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন,—প্রভাবতি, সতি,সাধ্বি,—তোমাদের অবগাহন হইয়াছে, রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট হও,—রাজার গত কার্য্য ভুলিয়া যাও; তুমি অবশ্য ভুলিতে পারিবে, নচেৎ তোমাকে বলিতাম না; তারপর এই মন্ত্র গ্রহণ কর;—চিরজীবনের তরে এই তোমাদের মূলমন্ত্র হউক;—তারপর সংসারে যাও,—যাইয়া 'যোগজীবন' যাপন কর। তোমাদের 'যোগজীবনের' দৃষ্টান্তে অধর্ম্ম, অত্যাচার, ব্যভিচার, পাপতাপ সকল বঙ্গপ্রদেশ হইতে তিরোহিত হইবে। চিরদিন তুমি স্বামীর কল্যান কামনা করিয়াছ, আজ হইতে অনন্তকাল স্বামীর সহিত মিলিয়া দেশের মঙ্গল কামনা করিবে,—'যোগজীবনের' প্রকৃত মহত্ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

তারপর বৃদ্ধ রাজাকে বলিলেন,—নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে জন সতীকে অবহেলা করে, তার ন্যায় পাপী, নরাধম জগতে নাই;—তুমি যে প্রভাবতীর

চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়াছ, তাহাতেই তোমার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য আমি অনুভব করিয়াছি ;—কেবল অনুভব করি নাই,—তোমার বর্ত্তমান সমস্ত অবস্থাই আমি জ্ঞাত আছি,—এই পৃথিবীতে প্রভাবতীই তোমার একমাত্র বন্ধু, আর সকলেই তোমার শত্রু। সৌভাগ্যের বিষয় তুমি আপন অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ। যাঁহার প্রসাদে তোমার চৈতন্যলাভ হইল, তাঁহাকে স্মরণ কর, এই মর্ত্তালোকে তিনিই মানবের একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন। তারপর এই মন্ত্র গ্রহণ কর,—চিরদিন পবিত্র অন্তরে এই মন্ত্র জপ করিবে। যদি হৃদয় আবার অপবিত্র কর,—যদি আবার সতীর অবমাননা কর, তোমার জীবন চিরকালের তরে কলঙ্কিত হইবে,—এই সতীকে হারাইবে। সাবধানে থাকিবে। অনেকে ঘৃণা করিবে, অনেকে গালাগালি করিবে, অবিশ্বাসী জগতের অনেক লোক তোমার শত্রু হইবে, কিন্তু সাবধান, কোন দিকে মনকে ফিরাইবে না, দিন রাত্রি এই মন্ত্র জপ করিবে। প্রত্যহ যে প্রকার ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিবে, সেই প্রকার প্রত্যহ সতীর মাহাত্ম্যের পূজা করিবে,—মনুষ্যকে ভালবাসিবে,—মনুষ্যকে ভক্তি করিবে। আর উপদেশের জন্য কাহারও পানে চাহিবে না, আপন হৃদয়ের পানে সরল তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যখন চাহিবে, তখন পরম মাতা জগদীশ্বরী তোমার সকল প্রশ্ন মীমাংসা করিয়া দিবেন। 'যোগজীবনের' তত্ত্বভেদ করিতে শিক্ষা করিবে ;—আপনাকে স্বর্গ ও সংসারের মধ্যে রাখিয়া উভয়দিকে চাহিবে,—কেবল স্বর্গের পানে চাহিবে না, কেবল সংসারের পানেও চাহিবে না। স্বর্গ ছাড়িয়া যে সংসারকে সার করে, তাহার জীবন ক্রমেই অবনত হয়, পাপ তাপে জড়িত হয় ;—যে সংসারের কথা ভুলিয়া কেবলই স্বর্গের পানে চায়, তাহার হৃদয় ক্রমেই শুকাইয়া যায়,—ভগবানের রাজ্যের লীলা খেলা না করিলে প্রেমশিক্ষা হয় না, ভক্তিশিক্ষা হয় না,—মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। ভগবান তোমাকে মানুষ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, দেবতা করিয়া সৃজন করিয়াছেন। এ দুই চাই, কোনটীকে অবহেলা করিবে না। দুই দিকে আত্মার যোগ হইবে,—এক দিকে স্বর্গ এবং এক দিকে সংসার, এক দিকে জগদীশ্বরী এবং এক দিকে মনুষ্য সন্তান,—সৎসন্তান। ভগবৎভক্তি, সংসারভক্তি, এই দুইয়েতে তোমার অনুরাগ হইবে। যখন স্বর্গের পানে তাকাইতে কষ্ট হইবে, তখন সংসারের নিকট প্রেমভক্তি শিক্ষা করিবে ; যখন পাপতাপপূর্ণ, প্রলোভনপূর্ণ সংসারের পানে চাহিতে কষ্ট হইবে, তখন ভগবানের নিকট বিনীতমস্তকে প্রেম ভক্তি

প্রার্থনা করিবে ;—যোগশাস্ত্রের এই মূল শিক্ষা ;—দুইয়েতে মিলন, এই যোগ-শাস্ত্র। সংসারে একপ্রকার ধার্ম্মিক আছেন, যাঁহারা সংসারকে যোগের অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে বলেন ; মনে রাখিবে, তাঁহারা ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। জনক, রাজা ছিলেন, ঋষি ছিলেন ; তুমিও রাজা হইয়া ঋষি হইবে। মনুষ্য কেবল রাজ্যশাসন করিবে না, ধর্ম্ম সাধন করিবে। মানব কেবল ধর্ম্মসাধন করিবে না, সংসার সাধন করিবে। ঈশ্বরের সংসার কি ভস্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বরের সংসার কি ধ্বংশ হইতে হইয়াছে? কেবল বৈরাগ্য, অধর্ম্ম,—কেবল আসক্তি,অধর্ম্ম। সংসার চাই, স্বর্গ চাই, মনুষ্য চাই, ভগবানকে চাই,—সাধনায় সংসার স্বর্গ হয়, স্বর্গ সংসার হয়, এই যোগ-ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম। তুমি সিংহাসনে বসিয়া যোগী হইবে ;—সংসারকে এবং ভগবানকে যোগবলে হৃদয়ে বাঁধিবে। যদি সংসারকে পরিত্যাগ কর, তোমার অধর্ম্ম হইবে,—যদি ভগবানকে পরিত্যাগ কর, তোমার জীবন চিরকালের জন্য ডুবিবে। আমি যে মন্ত্র বলিলাম, এই মন্ত্রে তোমার স্বর্গ সাধন হইবে, আর এই যে সতী তোমার সম্মুখে, ইহার চরণ পূজায় তোমার সংসার সাধন হইবে। এই মন্ত্রে তুমি ভগবানকে পাইবে, আর এই সতীর সেবায় তুমি সংসারকে পাইবে। এই দুই অমূল্য পদার্থকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া লও। এই দুই বস্তুতে তোমার সর্ব্বস্ব নিহিত ;—ঐ স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে, এই পৃথিবী মস্তক তুলিয়া স্বর্গে পরিণত হইবে। এই দুই বস্তুকে রক্ষা করিতে পারিলেই তোমার যোগ সিদ্ধ হইবে, তোমার জীবন 'যোগজীবন' হইবে। 'যোগজীবন' সাধনে যখন তুমি সিদ্ধ হইবে, তখন ঐ স্বর্গ, আর এই পৃথিবী, এ উভয়ই তোমার করায়ত্ত হইবে। ধর্ম্মজগতে তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি থাকিবে, পৃথিবীতে তুমি প্রকৃত বীর বলিয়া পরিগণিত হইবে, দেশের সকল অভাব তোমার দ্বারা দূর হইবে। মা জগদীশ্বরী তোমাদিগের মঙ্গল করুন। শান্তি শান্তি শান্তি।

উপদেশ শেষ হইলে বৃদ্ধ উভয়কে যোগ-মন্ত্র প্রদান করিলেন, উভয়কে যোগাসনে বসাইয়া ধ্যানের মর্ম্ম বুঝাইলেন, এবং তিন জনে একত্রে ধ্যানে মগ্ন হইলেন। প্রজাপুঞ্জ দেখিয়া অবাক হইল। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল, তখন ধ্যানভঙ্গ হইলে বৃদ্ধ রাজাকে গৈরিক বসন পরাইলেন, এবং প্রভাবতীকে রাজবস্ত্র পরাইয়া উভয়কে ভদ্রেশ্বরে যাইতে আদেশ করিলেন এবং আপনি গমনোদ্যত হইলেন। প্রভাবতী বৃদ্ধকে আর কোন প্রশ্নই

জিজ্ঞাসা করিলেন না, রাজা প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, প্রভা নিষেধ করিয়া বলিলেন,—'আপন ইচ্ছায় যাহা বলিবেন, তাহাই শুনিবে, প্রশ্নের উত্তর পাইবে না।' বৃদ্ধ ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্য হইলে, শিবালয়ের প্রজাপুঞ্জ আহ্লাদে ভাসিতে ভাসিতে, রাজা ও রাজ্ঞীকে একত্রে লইয়া চলিল। যোগজীবনে দীক্ষা হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুনঃ ভদ্রেশ্বরে।

হরিহরের পত্র পাইয়া সংসারের কলঙ্কিনী সুশীলার হৃদয়ের আগুন আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল,—হরিহরের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া হতভাগিনীর অন্তরে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। সুশীলা আপনার জীবনের সমস্ত অধ্যায় একে একে স্মরণ করিয়া আবার ভুলিলেন, কিন্তু সুখের মায়ায় হরিহরের মমতা ছিন্ন করিয়াছেন, জীবনকে ডুবাইয়াছেন, একথাটী স্মৃতিকে অতিক্রম করিল না; কপালের ভোগ কে খণ্ডন করিবে, সুশীলা ইহা ভাবিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত যাতনা ভুলিতে প্রস্তুত হইলেন। সুশীলার পরিণাম মৃত্যু, লিখিতে কষ্ট হয়। সুশীলা বুদ্ধিমতীর ন্যায় চারি পাঁচ দিন অপেক্ষা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন;—"হরিহর গ্রহণ করিবে, তাতে তাহারই মহত্ত্ব, আমার কি? আমি কোন্ মুখে আবার হরিহরের নিকট উপস্থিত হইব? লজ্জা শরম ডুবাইয়া কেমন করে আবার এই মুখ দেখাইব? হরিহর অসৎ? সে কিছুই না, আমার সহিত তুলনায় সে স্বর্গের দেবতা? এ কথা কে না স্বীকার করিবে? যে স্বামী আমার ন্যায় কলঙ্কিনীকে আবার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তিনি নিশ্চয় দেবতা। সেই দেবতার সহিত আবার মিলিব? পাপ পুণ্য একস্থানে থাকিবে? কথনই হইতে পারে না। মিলন অসম্ভব। জ্যোস্না ও অন্ধকার একস্থানে,—কথনই সম্ভব নহে। আমার এই অন্ধকারময় হৃদয়ে সেই প্রেমচন্দ্র—সেই নিষ্কলঙ্ক—বিমল জ্যোতি শোভা পাইবে? তাহা অসম্ভব। হরিহর মানুষ, আমি নরকের কীট, কেমনে মানুষে আর কীটে মিলন হইবে?

হরিহর বলেন,—আমার মধ্যে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে;—অনুতাপে আমার সকল পাপ চলিয়া যাইবে। সে অনুতাপ কই? অনুতাপের কি এই ভাব? —মিথ্যা কথা। আমার মধ্যে অনুতাপ নাই। কেন নাই? যে মানুষ, যার মধ্যে একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, তার মধ্যেই অনুতাপ উপস্থিত হয়। যেখানে একটুও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই, সেখানে কি ফুৎকারে আগুন জ্বলিবার সম্ভাবনা থাকে? আমার হৃদয়ে অনুতাপ নাই,—আমার আর ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, আমি চিরকালের জন্য ডুবিয়াছি।” সুশীলা এই প্রকার দুশ্চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া মনের শান্তি বিনাশ করিতে লাগিলেন; পৃথিবীতে তাহার কলঙ্ক মুখ লুকাইবার আর স্থান নাই ভাবিয়া, মৃত্যুর ক্রোড়ে লুকাইতে প্রস্তুত হই. লেন;—লক্ষ্মীপাশার সেই সুশীলা বিপদময় সংসারে এই দ্বিতীয়বার মৃত্যুর শান্তি-প্রদ ক্রোড়ালিঙ্গন করিতে উৎসুক হইলেন। সুশীলা হরিহরের পত্র পাইয়া, এই প্রকার অস্থির চিত্তে যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন রাজভবন শূন্য ছিল। রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ প্রায় কুড়ি দিন হইল শিবালয়ে গিয়াছেন,—তাঁহার আর ভদ্রেশ্বরের বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না,—এই কালভুজঙ্গিনীকে দেখিতে আর বাসনা হয় না। শান্ত-শীলা প্রভাবতী রাজাকে ক্রমে ক্রমে প্রবোধবাক্য দ্বারা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন,—‘অসৎ সংসারের সহিত যখন আমাদিগকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, তখন লোকের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকা উচিত নহে। অসৎ মনুষ্য লইয়াই সংসার চলিতেছে, সেই সংসারকে তুচ্ছ না করিয়া যাঁহারা সাধুতার দ্বারা ভূষিত করিতে সক্ষম হন, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য।’ এই প্রকার নানা প্রকার কথা বলিয়া প্রভাবতী রাজাকে বারম্বার ভদ্রেশ্বরে যাইতে অনুরোধ করিলে একদিন রাজা বলিলেন,—‘যে ভদ্রেশ্বরের কুহক মন্ত্রে একবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তোমার ন্যায় ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সে ভদ্রেশ্বরের কথা মনে হইলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—সেখানে আজও যে সেই বিষম ভুজঙ্গিনী আমার জীবনের সকল সুখকে দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না? কোন্ প্রাণে তোমার কথা শুনে আবার দংশন সহ্য করব? প্রভা, তোমার সে বারের কথা মনে করে দেখ,—ক্ষান্ত হও; আর আমাকে ঐ সর্ব্বনেশে স্থানে যাইতে ব’ল না।’ প্রভাবতী বলিলেন,—‘আমি সকলি বুঝি, কিন্তু বুঝিয়াও তোমাকে পুনঃ ঐ স্থানেই যাইতে পরামর্শ দি। কেন, জিজ্ঞাসা

করিবে? এ সম্বন্ধে চিরকালই আমার মত অক্ষুণ্ণ,—অন্যের মঙ্গল সর্ব্বদা প্রার্থনা করা এবং অন্যের সুখের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করাই প্রকৃত মহত্ত্ব, কারণ স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ না করিতে পারিলে কখনই মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই,—জগদীশ্বরী আমাদিগের অন্তরে থাকিলে আর কোন চিন্তা নাই, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অম্লানচিত্তে সংসারে প্রবেশ করিতে চল, বাধা বিঘ্ন, সকল প্রকার বিপদ নিমিষের মধ্যে তিরোহিত হইবে। তুমি যাহাকে ভুজঙ্গিনী বলিতেছ, জগদীশ্বরীর প্রসাদে কালে সে অমৃতনিকেতনে পরিণত হইতে পারে। এরাজ্যে সকলি নূতন, ঐশ্বর্য্য-বান লোক দরিদ্র হয়, দরিদ্র বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে অধিকারী হয়;—ঐ ঐশ্বর্য্য, ঐ সুখ, ঐ আশাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া যেখানে ইচ্ছা, চল, সকল বিপদ চলিয়া যাইবে। সেই বৃদ্ধের আদেশ স্মরণ কর, কখনও তাঁহার কথার অন্যথা হইতে পারে না।'

রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ প্রভাবতীর কথাকে অবহেলা করিতে পারিলেন না, অগত্যা ভদ্রেশ্বরে যাইতে অভিলাষী হইলেন,—আনন্দের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল।

সুশীলার নিকট এই আনন্দের সংবাদ নিরানন্দের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যে প্রভাবতীকে একদিন পদাঘাতে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, তাঁহার সকল সুখে কাঁটা দিয়া আপনি রাজরাণী হইয়াছিলেন, আজ আবার সেই সাধ্বী সতী গৃহে ফিরিতেছেন,—আপন তপস্যার বলে স্বামীর সহিত মিলিয়া ভদ্রেশ্বরে বিনয়ের ছবি দেখাইতে আসিতেছেন, এ সংবাদে তিনি আরো অস্থির হইয়া পড়িলেন; এক দিন দুদিন করিয়া কত দিন গিয়াছে,—তবুও সুশীলা মরিতে পারেন নাই,—এই সংবাদে আরো অস্থির হইলেন। কেন অস্থির হইলেন? হিংসায়? না—তাহা নহে। সুশীলার হৃদয়ে আর কোন ভাব নাই,—আপন পরিণাম ভাবিয়াই কাতর হইতেছেন,—আপন কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপে পুড়িতেছেন। সুশীলা মরেন না কেন? কোন্ মায়ায় রহিয়াছেন? সুশীলার জীবনে আর আশা ভরসা, কিছুই নাই, সুশীলা আগুনে পুড়িয়া মরিতেছেন। যে জন অনুতাপে দগ্ধ হইবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে, তার ভাগ্যে কি মৃত্যু সহজে ঘটে? অনুতাপে মনুষ্যের ভাবী জীবনের অঙ্কুরপাত হয়, মৃত্যু হয় না। সুশীলা দারুণ অনুতাপে জ্বলিতেছেন, ভগবান ইহার জন্য মৃত্যুকে নিকটে আনিলেন না। প্রকৃত অনুতপ্ত

ব্যক্তি কখনও আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করিতে পারে না। সুশীলার আর কি আছে? সুশীলা ভাবিতে লাগিলেন,—আহা! সরোজের সুকোমল কাঞ্চনসদৃশ কান্তি, হায়, কোন্ প্রাণে আমার ন্যায় পিশাচী ইহার প্রতি বিমুখ হইল? বিধাত! আমাতে কি মানুষের হৃদয় নাই, ভুলে কি তুমি আমাকে হৃদয়শূন্য করে সৃজন করেছিলে? হায়,আমার পরম হিতৈষী প্রভাবতী,—তার প্রতি কেমন করে অন্যায় রূপে শেল বিদ্ধ করেছিলাম!! কেমন করে রাজাকে বিষ প্রয়োগে মারিতে উদ্যত হয়েছিলাম!! আমি হতভাগিনী, বিধাত, আমি হৃদয়শূন্য নরকের কীট; আমার কি উপায় হইবে?" এই প্রকার ভাবিয়া ছিন্নমুণ্ড ছাগলের ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন, এমন সময়ে ভদ্রেশ্বরে জননী প্রভাবতী, রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ, প্রভার সন্তানগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। রাজার বেশ দেখিয়া ভদ্রেশ্বরের আবাল, যুবক, বৃদ্ধ, সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। রাজা সকলকে অভিবাদন করিয়া রাজভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন;—প্রভাবতী অধোমুখী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন। ভদ্রেশ্বরের পল্লী হইতে স্ত্রীপুরুষ সকলে রাজবাড়ীতে সমাগত হইতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে রাজবাড়ী জনতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। যাঁহারা প্রভাবতীর দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ প্রফুল্লচিত্তে প্রভার নিকটে আসিতে লাগিলেন, প্রভা পাড়াপ্রতিবেশিনীদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। রাজবাড়ী মঙ্গল বাদ্যে পরিপূর্ণ,—সুখহিল্লোলে আন্দোলিত,—জনতায় কোলাহলময়। রাজা এই প্রকার সুখপ্রবাহের মধ্য দিয়া আপন ঘরে যাইয়া দেখিলেন,—সুশীলা মৃত্তিকায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। প্রভাবতী আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—অমনি মৃত্তিকায় বসিয়া সুশীলার মস্তককে আপন ক্রোড়ে তুলিলেন, তারপর অঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন;—'ছি, বোন, কেন তুমি ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছ,--এবেশ কি তোমার সাজে? এতদিন পরে আবার তোমার সেবা করিতে আমি গৃহে ফিরিলাম।' প্রভাবতীর ব্যবহারে সুশীলা আরো অস্থির হইলেন, প্রভার ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া মৃত্তিকায় পড়িলেন, বলিলেন,—আমি কলঙ্কিনী, আমাকে তুমি ছুঁ'ও না। এই বলিয়া সুশীলা ক্রন্দনের স্বরে গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। রাজা এ চিত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যোগ-সাধনায়।

প্রভাবতীর অমানুষিক, অনাবিল স্বর্গীয় প্রেমের পরিচয় পাইয়া রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ মোহিত হইলেন;—বুঝিলেন, যদি পৃথিবীকে কোন শক্তি আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম হয়, তবে ইহাই সেই শক্তি। আপন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—অসার মৃর্ত্তিকার শরীর বহন করিতেছেন,—প্রভাবতীর তুলনায় আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে ঘটনাটীতে রাজার মনে এই প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে ঘটনাটী অতি সামান্য,—প্রভার নিকট তুচ্ছ বিষয়; কিন্তু রাজার মনে তাহাতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হইল;—সমস্ত দিবস আর কিছুই ভাল লাগিল না,—সমস্ত দিন ঐ একটী ভাব হৃদয়ে জপ করিলেন। প্রভাবতীর মহত্ত্ব, ও আপন পশুত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ও মন অস্থির হইল,—সমস্ত দিন নির্জ্জনে অশ্রু ফেলিলেন।—হায়, রাজার সে অশ্রুপতন কত সুন্দর!

প্রথম দিনেই অমায়িক স্বভাবের গুণে ভদ্রেশ্বরের ঘরে ঘরে প্রভার প্রশংসা ঘোষিত হইয়া পড়িল, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলে বলিতে লাগিল,—'এমন মেয়ে না হলে কি আবার রাজাকে পাইত? মেয়ের যেমন রূপ, তেমনি গুণ।' প্রভাবতী সুশীলাকে শান্তনা করিয়া বলিলেন,—"বোন, তোমারই সব, আমি ভিখারিণী, ঐশ্বর্য্য সুখে আমার কোন দরকার নাই, সকলি তোমার, আমি কেবল তোমার ভালবাসা চাই।" এই প্রকার কথা শুনিয়া সুশীলার অন্তরে আরো আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—'আমি যার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলাম, সে অম্লানবদনে সকল আমাকে দিতেছে, এ কি ব্যবহার!' সুশীলার হৃদয় প্রভাবতীর ব্যবহারে আরো অস্থির হইল, ভদ্রেশ্বরে আর মুহূর্ত্ত মাত্র থাকিতে ইচ্ছা হইল না। সৎ না হইয়া, অসাধু ব্যক্তি কি কখনও সাধুতার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? আগুনে যেমন অসার আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হয়, প্রকৃত সাধুতায় সেই প্রকার অসার অসৎতৃণ ভস্ম হইয়া যায়।

সুশীলার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার অসংভাব কম্পিত হইতে হইতে যেন আজ প্রভার চরিত্রের দ্বারা ভস্ম হইতেছে ;— আর বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

সমস্ত দিবস এই ভাবে গত হইল, এক দিকে রাজার মনে অনুতাপ ; অপর দিকে সুশীলার আত্মগ্লানি ; প্রভাবতী দুইদিকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন। আজ কেবল দুই দিকে আগুন লাগিয়াছে, সময়ে প্রভা দেশের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া তুলিবেন।

রজনীতে রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে প্রভাবতীর কুটীরে প্রবেশ করিলেন,—আপন জঘন্য চরিত্র স্মরণে কম্পিত কলেবরে প্রবেশ করিয়া দেখি-লেন, প্রভা শক্তিআরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন,—দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে। শক্তির আরাধনা,কেন বলিতেছি ? শক্তির আরাধনা না করিলে প্রভা এত শক্তি, এত বল কোথায় পাইবেন ?—কাঙ্গালিনী আজ আপন প্রভায় ভদ্রেশ্বরকে উজ্জ্বল করিতেছেন;—প্রভাবতী সত্যই শক্তির আরাধনা করিতেছেন। রাজা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, প্রতি পদনিক্ষেপে তাঁহার অন্তর কম্পিত হইতেছিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইতে-ছিল। প্রভাবতীর সম্মুখে যাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উপবিষ্ট হইলেন ;— ভালবাসার মাহাত্ম্য, প্রেমের লীলা, ভক্তির খেলা, বিশ্বাসের জ্বলন্তভাব ঐ মলিনার মুখে দেখিতে লাগিলেন। রাজা গৃহে কি মহাশক্তি আনয়ন করিয়াছেন !—এ শক্তি তরবারি উত্তোলন করিয়া বিদ্রোহী শত্রুর মস্তক দ্বিখণ্ড করে না, অথচ বিদ্রোহী শত্রুর মস্তক নত হয়,—সাপুরিয়ার মন্ত্রবলে সর্পের মস্তক যেরূপ নত হয়, শত্রুর মস্তক সেই প্রকার নত হয় ;—এ শক্তি উপদেশ দিয়া, বক্তৃতা করিয়া দেশকে মাতাইয়া তুলে না, অথচ দেখিতে দেখিতে এই নীরব শক্তির প্রভাবে দেশ আপনা আপনি মাতিয়া উঠে। শত্রুকে দমন করিবার কি এক আশ্চর্য্য শক্তি রাজা ঘরে আনি-য়াছেন। শত্রু বিষ প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছিল, হস্ত অমনি অবশ হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে শত্রু মিত্র হইয়া উঠিল। রাজ-গৃহে মহাশক্তির আরাধনা হইতেছে,—আহ্লাদে অনুন্মত্ত, দুঃখ ক্লেশে অনাসক্ত বীর আজ গৃহে শক্তির আরাধনা করিতেছেন। নদিয়াবাসী একদিন যে শক্তির আরাধনা দেখিয়াছিল, পালেসটাইনবাসী একদিন যে শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়াছিল, আজ ভদ্রেশ্বরের রাজগৃহে সেই শক্তির আরাধনা হইতেছে।—লোকে দেখি-বেই বা কি, বুঝিবেই বা কি ? রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ লীলাখেলা দেখিয়া

উন্মত্ত হইলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া প্রভার পা ধরিয়া বলিলেন ;—'প্রভা, দেবি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার গৃহে চল, আর তোমাকে আমি অবহেলা করিব না।'

প্রভাবতী রাজার কথার কিছুই অর্থ বুঝিলেন না, অন্যমনস্ক অবস্থায় বলিলেন,—আমি যে ঘরে আসিয়াছি, তা কি তুমি দেখিতেছ না ?

রাজা পুনঃ বলিলেন, কোথায় ঘর ? এ ঘর যে আজ শ্মশান হইয়া গিয়াছে, তাহা কি বুঝিতেছ না ?—আমার ঘরে চল।

প্রভা বলিলেন,—এই ত তোমার ঘর, তোমার ঘরেই ত আসিয়াছি।

রাজা।—আমার ঘরে তুমি এক্ষণও প্রবেশ কর নাই,—তুমি যদি প্রবেশ করিতে, তবে এতক্ষণ আমার ঘর পূর্ণ হইত, ঘরের আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইত, গৃহ পবিত্র হইত। প্রভা, আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়-কুটীরে একবার পদনিক্ষেপ কর। আমি অপরাধী,—নরাধম, আমার সকলি মনে আছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া যতক্ষণ গৃহে পা না ফেলিবে, ততক্ষণ আমার আর নিস্তার নাই।

প্রভাবতী বলিলেন,—প্রাণেশ্বর, আমি কোন্ দিন তোমার কোন্ অপরাধ গণনা করেছি, তুমি আমার নিকট কি অপরাধ করেছ, কিছুই স্মরণ নাই,—তোমাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিন রাত্রি জপ করিয়াছি ;—তোমাকে জপ করিয়াই মা ভগবতীর আরাধনা শিখিয়াছি। তুমিই আগে, তারপর আমার আর সকল ;—তোমার গৃহই আমার গৃহ, আমার গৃহই তোমার গৃহ, আমার হৃদয়ই তোমার, তোমার হৃদয়ই আমার। কেন ভ্রমে পড়িয়া গৃহে যাইবার কথা বলিতেছ ? আমার গৃহে সেই বাল্যকাল হইতে তোমাকে দেখিয়া তোমার আরাধনা করিয়াছি,—তোমার গৃহে কি আমি ছিলাম না ?

রাজা বলিলেন,—"আমি হতভাগ্য, নরাধম, লোকের চক্রান্তে, লোকের কুহক মন্ত্রে ভুলিয়া আমার গৃহ হইতে তোমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, এই দেখ, সেই অবধি আমার গৃহ শূন্য। যে দিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, সেই দিন হইতে এপর্য্যন্ত কেবলই অশ্রুপাত করিয়াছি। লোকে মনে করিয়াছে, আমি বড় সুখে ছিলাম, কিন্তু আমার অন্তরের ভাব কেহই দেখে নাই। এই শূন্য গৃহে, প্রভা, আজ আমার কাঙ্গালিনীকে তুলিয়া লইব, এই সাধ হইয়াছে। তুমি কি কাঙ্গালিনী ? না—তাহা নহে, তুমি রত্নেশ্বরী, শক্তীশ্বরী ;—তোমাকে লইয়া আমি সকল অভাব দূর

করিব।” এই বলিয়া রাজা অবিরল ধারায় চক্ষের জল ফেলিতে লাগি-লেন। প্রভাবতী আপন বসনাঞ্চল দ্বারা রাজার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—হৃদয়েশ্বর, এই আবার তোমার গৃহে আসিলাম, আমি আর কখনও একাকিনী জগদীশ্বরীর আরাধনা করিব না;—একত্রে মিলিয়া আজ হইতে ভগবতীর আরাধনা করিব। এই বলিয়া স্বামীর হস্ত ধারণ করিলেন, এবং উভয়ে একত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এই প্রকারে সেই দিন হইতে প্রভাবতী ও রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ একত্রে আহার, একত্রে উপবেশন, একত্রে ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। প্রভা-বতীর পরাক্রমে রাজা এবং ক্রমে ক্রমে ভদ্রেশ্বরের সমস্ত অধিবাসীর মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রভার স্বভাবের গুণে সমস্ত দেশ মধ্যে এক মহা অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সুশীলা,—হতভাগিনী, কি করিলেন? হরিহরের সেই কলিকাতার বন্ধু যথাসময়ে ভদ্রেশ্বরে উপস্থিত হইয়া সুশীলাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব শুনিয়া প্রভাবতী ও রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ বিষয়সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ সানন্দচিত্তে সুশীলার নামে লিখিয়া দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু সুশীলার মন তখন প্রভাবতীর আকর্ষণে পড়িয়াছে। ঘূর্ণিত (পাক) জলে নৌকা পড়িলে যেমন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে, বলপ্রয়োগেও স্থানান্তরিত হয় না, সেই প্রকার সুশীলার আর কোন ক্রমেই স্থানান্তরিত হইতে বাসনা নাই; মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন,—মরিতে হইলেও ঐ প্রভাবতীর চরণ পূজা করিয়া মরিবেন, বাঁচিতে ইচ্ছা হইলেও ঐ প্রভার মুখের শোভায় ভুলিয়া বাঁচিবেন। হরিহরের বন্ধু অনেক যত্ন করিলেন, প্রভাবতী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সুশীলা আর ভদ্রেশ্বর পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। প্রভাবতী বলিলেন, “ভগ্নি, তুমি যেখানেই থাক, সেই খানেই আমি মধ্যে মধ্যে যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।” এ কথার উত্তরে সুশীলা বলিলেন,—“তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথায়ও যাইতে আমার অভিলাষ নাই।”

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! হরিহরের পত্র পাইয়া কোথায় সুশীলা আহ্লাদিত মনে হাসিতে হাসিতে হরিহরের আদিষ্ট পথে যাইবেন, না একেবারে অন্য-দিকে চলিলেন। এ ব্যাপারের মর্ম্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কোন্ সূত্রে ভগবান কাহাকে কোন্ পথে লইয়া যান, তাহা কেহই বলিতে

পারে না। হরিহরের বন্ধু চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া যথাসময়ে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন, এবং হরিহরের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিলেন। হরিহরের বন্ধুর পত্রের পূর্ব্বেই সুশীলা নিম্নলিখিত পত্রখানি হরিহরের নিকট প্রেরণ করিলেন ;—

প্রিয় হরিহর,—

ভগবান তোমাকেও দুঃখী করিয়াছেন, আমাকেও দুঃখিনী করিয়াছেন আমাদের জন্য ভূমণ্ডলে সুখ ও শান্তি রাখেন নাই। তুমিও কারাগারে চক্ষের জলে সিক্ত হইতেছ, আমিও দিনরাত্রি কাঁদিতেছি। কেন কাঁদিতেছি,—কার জন্য কাঁদিতেছি,—শুনিবে? জননী প্রভাবতীর প্রতি আমি যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, আমার আজও তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। রাত্রে ঘুমাইতে চেষ্টা করি, পোড়া চক্ষে ঘুম আসে না, দিবসে অন্য মনস্ক হইতে চেষ্টা করি, কোন ক্রমেই পারি না,—দিবানিশি হু হু করিয়া হৃদয়ের মধ্যে ঐ অশান্তির কথা জাগিতেছে ;—কে যেন আমার মস্তকের উপর থাকিয়া থাকিয়া, পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিয়া থাকিয়া, ঐ কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আমার আর গতি নাই, আমার আর উপায় নাই। আমি এক্ষণ বুঝিতেছি, তোমাকে পাইলেও আমার হৃদয়ের এ অনল নির্ব্বাপিত হইবে না।—কখনই হইতে পারে না। প্রভাবতীকে জননী কেন বলিলাম? তুমি জান, প্রভাবতীকে আমি সতিন ভাবিয়া একদিন রাজভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রভাবতীর মুখে কখনও কটু কথা শুনি নাই, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি,—সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে সমান ভাবে আদর করিয়া আসিতেছেন? কেবল আদর? তিনি কত যত্ন করিয়া আমার মনে শান্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই পৃথিবীর মধ্যে এমন আত্মীয় বন্ধু আর আমার কে আছে? প্রভাবতীই আমার জননী;—জননী ভিন্ন সন্তানের অপরাধ ভুলিয়া কে কৃপা বিতরণ করিতে পারে? এই জননীই আমার একমাত্র পৃথিবীর মধ্যে আত্মীয়, সুহৃদ। এই জননীর প্রতি আমি গত জীবনে যে সকল অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আর এই কলঙ্কিনীর মস্তক হইতে প্রক্ষালিত হইবে না—অন্তরে বাহিরে ঐ সকল অত্যাচার আমার আত্মার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়া শান্তি অপহরণ করিতেছে। আর কোথায় যাইব? কলিকাতা যাইতে আর অভিলাষ নাই, কারণ সেখানেও আমার হৃদয়ে শান্তি পাইব না। কলি-

কাছায় গেলে হৃদয়ে শান্তি পাইব না,—অথচ জননী প্রভাবতীকে জন্মের মত হারাইব। আমার সাধের জননীকে হারাইয়া কোন মরুভূমিতে যাইতে আর আমার সাধ নাই। প্রভাবতীকে আমি এত দেখিতে চাহি কেন,—শুনিবে? প্রভাবতীকে দেখিলে যেন আমার প্রাণ শীতল হয়, এই যে অন্তরের ভিতরে আগুন জ্বলিতেছে, এ আগুনও যেন নিবিয়া যায়। তুমি যদি প্রভাবতীকে একবার দেখিতে, তবে নিশ্চয় তোমার মনেও এই ভাব হইত! হায়, জীবনে যে প্রভাকে দেখিল না, তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর ভূমণ্ডলে নাই।

আমার ভুল হইয়াছে, কি ছাই উন্মত্তের ন্যায় লিখিতেছি? আমি কি পাগল হইয়াছি? হা, নিশ্চয় পাগল হইয়াছি। কেন পাগল হইয়াছি? একদিন তোমার জন্য পাগল হইয়াছিলাম,—আজ কাহার জন্য পাগল হইয়াছি? তোমাকে পাইবার জন্য? কখনও মনে করিবে না;—আমার জীবনের সে দিন আর নাই;—আর তোমাকে পাইলেও হৃদয়ে শান্তি পাইব না, না পাইলেও শান্তি পাইব না। আমি আজ শান্তি হারাইয়া পাগলিনী হইয়াছি;—পৃথিবীর সুখ দুঃখকে আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার মধুর কথা, মধুর হাসি, তোমার শরীরের কান্তি এ সকলই আজ অপ্রিয়,—আমার নিকট এ সকলি আজ অকিঞ্চিৎকর। প্রভাবতীর তুলনায় সমস্ত সংসার অকিঞ্চিৎকর। ঐ প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ত তুমি কখনও দেখিলে না,—তুমি কি বুঝিবে?—তোমারি সেই বসন্তকুমারী আজ পৃথিবীতে কি রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা ত তুমি দেখিলে না, তুমি আর কি বুঝিবে? ঐ রূপ দেখিয়া আমি আজ উন্মাদিনী হইয়াছি। হরিহর, তোমাকে আর কি লিখিব? আমার জন্য তুমি দিনরাত্রি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে।

আমি যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন এই ভদ্রেশ্বরেই পড়িয়া থাকিব। তুমি যখন খালাস পাইবে, তখন এই হতভাগিনীকে দেখিতে এই ভদ্রেশ্বরেই উপস্থিত হইবে। তোমার হতভাগিনী—উন্মাদিনী—সুশীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উৎসর্গ।

হরিহর বাবু সুশীলার পত্র পাইয়া অবাক হইলেন;—হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। যাহাদিগের অনিষ্ট চিন্তা হরিহরের জপমন্ত্র,—দিবানিশি, অবিরাম যাহাদিগের অনিষ্টচিন্তা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাহারা আবার ভদ্রেশ্বরে মিলিত হইয়াছে,—সুখ ও শান্তির অধিকারী হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া হরিহর বড়ই বিষণ্ন হইলেন। তাহার হৃদয়ের মধ্যে দারুণ জ্বালা আরম্ভ হইল;—বিষে সর্ব্বশরীর জর্জ্জর হইল,—দিবসের শান্তি, রজনীর নিদ্রা, সকলি হরিহরের নিকট হইতে বিদায় হইল। একদিকে নির্ব্বাসিতা বসন্তকুমারী আবার রাজার ভালবাসা পাইয়াছেন,—আবার ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, ইহা হরিহরের হিংসপূর্ণ প্রাণের অসহ্য। অন্যদিকে সুশীলা সেই বসন্তকুমারীর নিকট চিরদিনের জন্য দাস-খৎ লিখিয়া দিয়াছেন, ইহা হরিহর কি প্রকারে সহ্য করিবেন? সহস্র রসনায় যদি বসন্তকুমারীর নিন্দা রটনায় হরিহর প্রবৃত্ত হন, তবু আর কিছু করিতে পারিবেন, সে আশা নাই; তবে উপায় কি? হরিহরের কথাই বা কে বিশ্বাস করিবে? হরিহরের কথা লোকে বিশ্বাস করিবে না, এ কথা ভাবিয়া হরিহর আজ নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না; আজ একবার অনিষ্ট-চেষ্টায় রত হইতে ইচ্ছা হইতেছে;—আজ একবার বসন্তকুমারীর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যে মনুষ্যের মধ্যে দুর্জ্জয় হিংসা রিপু একবার সিংসাহন পাতিয়াছে, তাহার আর আপন শক্তির পরীক্ষা বা চিন্তা করার সময় থাকে না। হরিহর, বসন্তকুমারী বা রাজা গজেন্দ্র-নারায়ণের অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন কিনা, সে বিষয়ে না ভাবিয়া একেবারে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। হরিহরের যে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাহাদিগের নিকট প্রথমে বসন্তকুমারীর বিরুদ্ধে লিখিলেন; তারপর সুশীলার নিকট বসন্তের অনেক প্রকার দোষ উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, তারপর ভদ্রেশ্বরের অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীর নিকটে উভয়ের বিরুদ্ধে লিখিলেন। যাহা কখনও জ্ঞানচক্ষু কি বসন্তের মধ্যে হরিহর দেখেন নাই, এমন

সকল মিথ্যা ঘটনা সৃজন করিয়া অন্যের মন চটাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহাকে লিখিলেন,—'বসন্তকুমারী একজন দুষ্ট লোকের সহিত মিলিয়া, রাজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার জন্য, ঐ প্রকার ধর্ম্মের ফাঁদ পাতিয়াছে' কাহাকে লিখিলেন,—'গজেন্দ্রনারায়ণ দেশের সকল লোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আপনার জাতি ধর্ম্ম ডুবাইয়া, অন্যকে পর্য্যন্ত পতিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।' কাহাকে লিখিলেন,—'গজেন্দ্রনারায়ণ যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন একজন প্রসিদ্ধ বদ্‌লোক ছিলেন।' কাহাকে লিখিলেন,—'বসন্তকুমারী অসতী।' এই প্রকারে তিনি চতুর্দ্দিকে গজেন্দ্রনারায়ণ ও প্রভাবতীর মিথ্যা দোষ রটনা করিতে লাগিলেন। ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; গজেন্দ্রনারায়ণের নিকট লিখিলেন ;—'আমি আপনার বিশ্বাসের যোগ্য কি না, জানিনা, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনাকে সতর্ক না করিয়া পারিলাম না ;—আমার কথাটী ভাবিয়া দেখিবেন। আমি প্রভাবতীর পত্রাদি সর্ব্বদাই পাইতাম, প্রভা আমার সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু আমি নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিলাম ; বলিতে কি, আমার আশায় নৈরাশ হইয়া প্রভা অন্য একজন লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে মিলিত হইয়াছে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, প্রভাবতী সেই লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার সমুদায় ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিবার চেষ্টায় আছেন, আপনি সতর্ক হইবেন। আপনি চতুর লোক, কুহক মন্ত্রে ভুলিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইবেন না। আর একটী কথা,—ঐ কুহকিনীর কথায় ভুলিয়া আপন পৈতৃকধর্ম্ম ডুবাইয়া দিবেন না। দেশের কি দুর্ভাগ্যের বিষয় ;—ব্যাস, বাল্মীকির নাম লোপ পাইয়া গেল,—রামা শ্যামার আধিপত্য বিস্তৃত হইল। আপনি একজন বিজ্ঞলোক, যখন যাহা করেন, একজন দার্শনিক পণ্ডিতের পরামর্শ লইয়া করিবেন। আপনি আর্য্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, ইহা কখনই প্রাণে সয় না। ঐ ধর্ম্ম নির্ধন বা মূর্খের পক্ষেই শোভা পায় ; ধনী, জ্ঞানীর পক্ষে কি ঐ ধর্ম্ম সাজে !! আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে রামা শ্যামার কথা শুনে চলা উচিত নহে।' সুশীলার নিকট লিখিলেন ;—"তুমি নির্ব্বোধ, নচেৎ কখনও প্রভাবতীর মায়ায় ভুলিয়া আপনার ভাবী সুখ বিসর্জ্জন দিতে না। প্রভাবতীর রূপ আমি দেখি নাই, তুমি লিখিয়াছ, কিন্তু আমি উহাকে বিলক্ষণ জানি ; বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কখনও ভুলিবে না, প্রভাবতীর অন্তরের মধ্যে গরল লুক্কায়িত রহিয়াছে। তুমি

যাহার রূপ দেখিয়া মোহিত হইতেছ, আমি তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি। ভালমন্দ বুঝিবার তোমাদের কি শক্তি, তোমরা অবলা ;—অল্পেই তোমরা মোহিত হও, অল্পেই নৈরাশ হও। মনুষ্য চরিত্র শিক্ষা করিবার তোমাদের কোন উপায় নাই, হায়, তোমাদের দশা কি হইবে ?” হরিহর,এই প্রকার নানা উপায়ে, প্রভাবতী ও গজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ব্যক্তি হরিহরের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিল, কারণ ভদ্রেশ্বরে ইতিপূর্ব্বেই দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসিক পৌত্তলিক অনুষ্ঠান সকল স্থগিত হইয়া গিয়াছিল,—ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এ বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল ;—জ্ঞাতি কুটুম্বেরা স্বার্থের দ্বার বন্ধ হইতে দেখিয়া সকলেই মর্ম্মে আঘাত পাইতেছিল। এই সময়ে হরিহরের পত্র পাইয়া অনেকে রাজার নিন্দা রটাইতে আরম্ভ করিল,—চরিত্রে দোষারোপ করিতে লাগিল। রাজা যখন দুশ্চরিত্র ছিলেন, তখন যাহারা কোন কথা বলে নাই, তাহারাও এই সময়ে খড়্গহস্ত হইল। গজেন্দ্রনারায়ণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলনের মধ্যে পতিত হইলেন। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল,—‘প্রভাবতী রাজার সর্ব্বস্ব অপহরণের চেষ্টায় আছেন,—দেশের উপকারের ভান করিয়া সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার মানসে আছেন,’ এই প্রকারে অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল। রাজা সৎপথে পদনিক্ষেপ করিয়া এই প্রকার মহা আন্দোলনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। প্রভাবতী এ সমস্ত ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন ; চারিদিকের লোকেরা যে, এ প্রকার অনিষ্ট চিন্তায় রত হইবে, ইহাতে আর প্রভার সন্দেহ ছিল না। তিনি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, সাধুতার দ্বারা সকলকে জয় করিবেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এক দিন সকল প্রকার আন্দোলনই চলিয়া যাইবে। কিন্তু রাজার মন একটু আন্দোলিত হইয়াছে যখন তিনি বুঝিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় একটু উদ্বেলিত হইল,—মনের মধ্যে একটু দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। এই সময়ে সেই বৃদ্ধ সহসা ভদ্রেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ যেন প্রভার বিপদের একমাত্র সহায় হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধের আগমনে প্রভাবতী এবং রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। বৃদ্ধকে দেখিয়া উভয়ের মন সবল হইল,—ভদ্রেশ্বর যেন পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে অনেক পণ্ডিত আগমন করিলেন,

তাঁহারা কেহ বা বৃদ্ধের ধর্ম্মভাব দেখিয়া, কেহবা বিনয়ের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন। যাঁহারা তর্ক করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আর মুখ খুলিয়া কথা বলিতে পারিলেন না। হরিহরের পত্রে যাহাদিগের মন বিচলিত হইয়াছিল, বৃদ্ধের কথা শুনিয়া তাহাদিগের সকল প্রকার সন্দেহ তিরোহিত হইল। তিনি গজেন্দ্রনারায়ণকে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া আবার ভদ্রেশ্বর পরিত্যাগ করিলেন,—"সংসারকে যদি জয় করিতে বাসনা থাকে, তবে কখনও লোকের কথার দ্বারা চালিত হইবে না ;—লোকের ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থচিন্তা এ সকল অনেক সময়ে তোমাকে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তুমি কখনও এ সকলের দিকে কর্ণপাত করিবে না। লোকে তোমাকে ঘৃণা করিলে,তুমি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিবে,—লোকে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে, তুমি তাহার পরম উপকার করিবে। প্রহারে প্রহার, হিংসায় হিংসা, ঘৃণায় ঘৃণা, সংসারের এই সকল জঘন্য কথা ভুলিয়া যাইবে। মা জগদীশ্বরীর উপর কেবল নির্ভর করিয়া থাকিবে,—তিনিই লক্ষ্য,—তিনিই আশ্রয়,—তিনিই আশা, তিনিই ভরসা। সংসারে তুমি ধনী,—ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ ; কিন্তু তোমার ধন ঐশ্বর্য্য কোথায়,তাহা জান ? প্রভাবতীই তোমার ধন, প্রভাই তোমার ঐশ্বর্য্য। সংসারের চক্রান্তে ভুলিয়া যে মুহূর্ত্তে তুমি ইহাকে পরিত্যাগ করিবে,সেই মুহূর্ত্তে তোমার স্বর্গ ও পৃথিবী, দুই অন্ধকারে আবৃত হইবে ;—তুমি একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িবে। পৃথিবীকে জয় করিতে চাও, প্রভার অঞ্চলকে দৃঢ়রূপে ধর ; আপনাকে জয় করিতে চাও, জগদীশ্বরীর চরণ সার কর। আমি চলিলাম, আর এজন্মে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবেনা,—কারণ আমি বারম্বার আসিলে, তোমরা মনে করিবে, আমি কোন স্বার্থ চিন্তায় আসিয়া থাকি। আমি আসিয়াই বা কি করিব,—তোমাদের পথ তোমরা পরিষ্কাররূপে দেখিয়াছ,—ঐ পথে গেলেই মুক্তির পথ পাইবে,—পুনঃ আমার আসিবার প্রয়োজন নাই ; আর যদি ঐ পথে না যাও, বদ্ধ কারাবাসে জীবন কলুষিত হইবে ; তাহা হইলেও আমার আসিবার প্রয়োজন নাই ;—তখন আমি আসিয়াও আর তোমাদিগকে ভাল করিতে পারিব না। আর একটী কথা,—আজ হইতে প্রভার ন্যায় ক্ষমা যেন তোমার জীবনের ভূষণ হয়,—শত্রুকে ক্ষমা করিবে, মিত্রকে ক্ষমা করিবে। ক্ষমাই ধর্ম্মসাধনের মূল মন্ত্র,—মূল দীক্ষা। হরিহর তোমাদের শত্রু,হরিহরকে সর্ব্বদা ক্ষমা করিবে ;—কখনও যেন হরিহরের অনিষ্ট চিন্তা তোমার মনে স্থান না পায়।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ গমন করিলেন। রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ আবার উৎসাহিত হইয়া আপন কর্ত্তব্য পথে চলিতে লাগিলেন।

সুশীলা এবার হরিহরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, পত্রের প্রতি ছত্রে যেন হিংসার পরিষ্কার ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে, বুঝিলেন; সুশীলা বৃদ্ধের আগমনের পূর্ব্বেই হরিহরের প্রতি বিরক্ত হইলেন। হরিহরের নিকট আর তাহার পত্র লিখিতে অভিলাষ হইল না; তিনি জননী প্রভাবতীর পদসেবা করিয়া জীবনের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্রতী হইলেন।

হরিহরের সকল চেষ্টা যখন বিফল হইল,তখন হরিহর আপনার পথ আপনি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখনও কারাগার হইতে মুক্ত হইবার অনেক বিলম্ব ছিল,—তিনি ক্রমে ক্রমে যশোহরের জেলখানা হইতে আগত সেই রমণীর অঞ্চলের ভিতরে আপনার সুখ দুঃখকে লুক্কায়িত করিতে উল্লসিত হইলেন। ধীরে ধীরে সেই রমণী হরিহরের অন্তরের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করিল,—ধীরে ধীরে হরিহরের ভালবাসা কাড়িয়া লইল। সেই জ্বরের পর হইতে হরিহরের অন্তরে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, ক্রমে সুশীলা যখন হরিহরকে তুচ্ছ করিয়া চরণে ঠেলিলেন, তখন সেই রমণীকে উত্তপ্ত জীবনের শান্তি-সলিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রখর রিপুর উত্তেজনায় মানব কি প্রকারে কুপথে পদনিক্ষেপ করে, তাহা সকলেই জানেন, সে সকল চিত্র দেখাইতে আমাদের আর অভিলাষ নাই। উভয়ের মধ্যে যখন প্রণয় সঞ্চারিত হইল, তখন উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলেন। যশোহর হইতে আগত সেই রমণী কে? আমাদের সাধের কুলীনকন্যা—জ্ঞানদা। বৃদ্ধ জ্ঞানদা কারাবাসিনী হইয়া এতদিন পরে সুশীলার সুখের বাজার কাড়িয়া লইলেন; হরিহর এতদিন পরে, কারাগারের মধ্যে, আপনার জীবননাশিনীকে সুখের আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন হরিহর, তেমন জ্ঞানদা;—এতদিন পরে উপযুক্ত পাত্রের সহিত উপযুক্ত পাত্রীর মিলন হইল। এতদিন পরে হরিহর ও সুশীলার প্রণয় স্বপ্নের ন্যায় হইল। কারাগারে থাকিয়া হরিহর ও জ্ঞানদা যখন পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন ইহাদিগের প্রতি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইল। হরিহর পূর্ব্বের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতে যথেষ্ট যত্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইহাদিগের উভয়ের পরিণাম অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল;—উভয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসে থাকিবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

সুশীলা ক্রমে ক্রমে প্রভাবতীর পদানুসরণ করিয়া জীবন লাভ করিলেন। প্রভা ও গজেন্দ্রনারায়ণ উভয়ে মিলিত হইয়া যখন দেশের অশেষ প্রকার দুর্গতি অপনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সুশীলা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন,—"ধর্ম্ম যাঁহার হৃদয়কে অলঙ্কৃত করে, সংসারের কোন বিপদ তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মই পৃথিবীতে একমাত্র মানবের কল্যাণের জিনিস।" সুশীলার ঘোষিত এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রচারে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম অপ্রচ্ছন্ন ভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রভাবতীর ধর্ম্মভাবে সুশীলা যে প্রকার আকৃষ্ট হইলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই প্রকার অনেক অধিবাসীর মনে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত হইল। ভদ্রেশ্বর শান্তির ভবনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভদ্রেশ্বর অল্প সময়ের মধ্যে তীর্থস্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 'যোগজীবন' যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রেশ্বর প্রকৃত সুখের স্থানে পরিণত হইল। ধর্ম্ম যখন প্রভা ও রাজার মধ্যে অটল, স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিল, তখনই ইহাঁরা 'যোগজীবনে' সিদ্ধিলাভ করিলেন। যোগ-জীবনে সিদ্ধিলাভ করিয়া, স্বামী স্ত্রী উভয়ে, বীরের ন্যায় কুসংস্কারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত জীবন এই প্রকার সংগ্রামেই অতিবাহিত করিলেন;—ফলের গণনা না করিয়া, উভয়ে অক্লান্ত অন্তরে জীবনের কর্ত্তব্য পথে আজীবন অগ্রসর হইলেন। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য 'যোগজীবন' উৎসৃষ্ট হইল।

সমাপ্ত।